ঈমানের পর যদি তারা পার্থিব সুখ ও ধনসম্পদ লাভ করে, তবে ইসলামে অটল হয়ে যায়, পক্ষান্তরে যদি পরীক্ষাস্বরূপ কোন বিপদাপদ ও পেরেশানীতে পতিত হয়, তবে ধর্ম ত্যাগ করে বসে।

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١٤﴾ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴿١٥﴾ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ﴿١٦﴾

(১৪) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন। (১৫) সে ধারণা করে যে, আল্লাহ্ কখনই ইহকাল ও পরকালে রসূলকে সাহায্য করবেন না, সে একটি রশি আকাশ পর্যন্ত ঝুলিয়ে নিক ; এরপর কেটে দিক ; অতঃপর দেখুক তার এই কৌশল তার আক্রোশ দূর করে কিনা। (১৬) এমনি-ভাবে আমি সুস্পষ্ট আয়াতরূপে কোরআন নাযিল করেছি এবং আল্লাহ্-ই যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে (জান্নাতের) এমন উদ্যানে দাখিল করবেন, যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। (আল্লাহ্ যে ব্যক্তি অথবা জাতিকে কোন সওয়াব অথবা আযাব দিতে চান, তা প্রতিরোধকারী কেউ নেই। কেননা,) আল্লাহ্ (সর্বশক্তিমান) যা ইচ্ছা করেন, করে যান। (সত্য ধর্ম সম্পর্কে যাদের বিতর্কের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, পরবর্তী আয়াতে তাদের ব্যর্থতা ও বঞ্চনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে) যে ব্যক্তি (রসূলের সাথে বিরোধ ও কলহ করে) মনে করে যে, (সে জয়ী হবে, রসূলের প্রচারিত দীনের উন্নতি স্তব্ধ করে দেবে এবং) আল্লাহ্ তা'আলা রসূলের (ও তাঁর দীনের) ইহকালে ও পরকালে সাহায্য করবেন না, সে একটি রশি আকাশ পর্যন্ত ঝুলিয়ে নিক (এবং আকাশের সাথে বেঁধে দিক)। এরপর এই রশির সাহায্যে যদি আকাশে পৌঁছতে পারে, তবে পৌঁছে এই ওহী বন্ধ করে দিক। (বলা বাহুল্য, কেউ এরূপ করতে পারবে না।) এমতাবস্থায় চিন্তা করা উচিত যে, তার (এই) কৌশল (যার বাস্তবায়নে সে সম্পূর্ণ অক্ষম) তার আক্রোশের

হেতু (অর্থাৎ ওহী) মওকুফ করতে পারে কি না। আমি একে (অর্থাৎ কোরআনকে) এমনিভাবে নাযিল করেছি (এতে আমার ইচ্ছা ও শক্তি ছাড়া কারও কোন দখল নেই)। এতে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি (সত্য নির্ধারণে) আছে এবং আল্লাহ্ তা'আলাই যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَنْ كَانَ يَظُنُّ----সারকথা এই যে, ইসলামের পথ রুদ্ধকারী শত্রু চায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূল ও তাঁর ধর্মকে সাহায্য না করুন। এরূপ শত্রুদের বুঝে নেওয়া উচিত যে, এটা তখনই সম্ভবপর, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুতের পদ বিলুপ্ত করে দেওয়া হবে এবং তাঁর প্রতি ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা যাঁকে নবুয়তের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং ওহী দ্বারা ভূষিত করেছেন, ইহকাল ও পরকালে তাঁকে সাহায্য করার পাকাপোক্ত ওয়াদা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রয়েছে। যুক্তির দিক দিয়েও এই ওয়াদার খেলাফ হওয়া উচিত নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি রসূল ও তাঁর ধর্মের উন্নতির পথ রুদ্ধ করতে চায়, তার সাধ্য থাকলে এরূপ কৌশল অবলম্বন করা উচিত, যাতে নবুয়তের পদ বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যায়। এই বিষয়বস্তুটি অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার ভঙ্গিতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে ওহী বন্ধ করতে চাইলে সে কোনরূপে আকাশে পৌঁছুক এবং সেখান থেকে ওহীর আগমন বন্ধ করে দিক। বলা বাহুল্য, কারও পক্ষে আকাশে যাওয়া আল্লাহ্ তা'আলাকে ওহী বন্ধ করতে বলা মোটেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং তার কৌশল যখন কার্যকর নয়, তখন ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে আক্রোশের ফল কি? এই তফসীর হুবহু দুররে-মনসূর গ্রন্থে ইবনে সায়দ থেকে বর্ণিত আছে। আমার মতে আয়াতের এটাই সর্বোত্তম ও সাবলীল তফসীর। (বায়ানুল-কোরআন ---সহজকৃত)॥

কুরতুবী এই তফসীরকেই আবূ জাফর নাহ্হাস থেকে উদ্ধৃত করে বলেন ঃ এটা সবচাইতে সুন্দর তফসীর। তিনি ইবনে আব্বাস থেকেও এই তফসীর বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ আয়াতের এরূপ তফসীর করেছেন যে, এখানে سماء বলে নিজ গৃহের ছাদ বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই ঃ যদি কোন মূর্খ শত্রু কামনা করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূল ও তাঁর ধর্মের সাহায্য না করুক এবং সে ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রোশ পোষণ করে, তবে সে বুঝে নিক যে, তার বাসনা কখনও পূর্ণ হবে না। এই বোকাসুলভ আক্রোশের প্রতিকার এ ছাড়া কিছুই নেই যে, সে তাঁর ছাদে রশি ঝুলিয়ে ফাঁসি নিয়ে মরে যাক।---(মযহারী)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ

وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ
وَالدَّوَاۗبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ۭ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۭ وَ
مَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاۗءُ ۝

(১৭) যারা মুসলমান, যারা ইহুদী, সাবেয়ী, খৃস্টান, অগ্নিপূজক এবং যারা মুশরিক, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। সবকিছুই আল্লাহ্র দৃষ্টির সামনে। (১৮) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ্কে সিজদা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে, যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ। আবার অনেকের ওপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ্ যাকে লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুসলমান, ইহুদী, সাবেয়ী, খৃস্টান, অগ্নিপূজক ও মুশরিক এদের সবার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন (কার্যত) ফয়সালা করে দেবেন (অর্থাৎ মুসলমানদেরকে জান্নাতে এবং সর্বশ্রেণীর কাফিরদেরকে জাহান্নামে দাখিল করবেন)। নিশ্চিতই আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

হে সম্বোধিত ব্যক্তি! তোমার কি জানা নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সামনে (নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী) সবাই বিনয়াবনত হয়---যারা আকাশমণ্ডলীতে আছে, যারা ভূমণ্ডলে আছে এবং (সব সৃষ্ট জীবের আনুগত্যশীল হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ পর্যায়ের জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী মানব সবাই আনুগত্যশীল নয়; বরং) অনেক মানুষও (অনুগত ও বিনয়াবনত হয়।) এবং অনেক মানুষ আছে, যাদের উপর আযাব অবধারিত হয়ে গেছে। (সত্য এই যে,) যাকে আল্লাহ্ হেয় করেন (অর্থাৎ হেদায়েতের তওফীক দেন না) তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। আল্লাহ্ (নিজ রহস্য অনুযায়ী) যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে বিশ্বের মুসলমান, কাফির, অতঃপর কাফিরদের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী দল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সবার ফয়সালা করে দেবেন।

তিনি প্রত্যেকের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। ফয়সালা কি হবে, কোরআনে তা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, সৎকর্মপরায়ণ ঈমানদারদের জন্য চিরন্তন ও অক্ষয় সুখশান্তি আছে এবং কাফিরদের জন্য চিরস্থায়ী আযাব। দ্বিতীয় আয়াতে জীবিত আত্মাধারী অথবা জড় পদার্থ ও উদ্ভিদ ইত্যাদি সব সৃষ্ট বস্তু যে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যশীল, তা 'সিজদার' শিরোনামে ব্যক্ত করে মানব জাতির দুইটি শ্রেণী বর্ণনা করা হয়েছে। এক, আনুগত্যশীল ফরমাবরদার, সিজদায় সবার সাথে শরীক। দুই, অবাধ্য বিদ্রোহী---সিজদার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী। আয়াতে আজ্ঞানুবর্তী হওয়াকে সিজদা করা দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। তফসীরের সার সংক্ষেপে তার অনুবাদ করা হয়েছে বিনয়াবনত হওয়া। ফলে সৃষ্ট জগতের প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক প্রকারের সিজদা এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কেননা, তাদের মধ্যে প্রত্যেকের সিজদা তার অবস্থা অনুযায়ী হয়ে থাকে। মানুষের সিজদা হচ্ছে মাটিতে মস্তক রাখা এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর সিজদা হচ্ছে যে উদ্দেশ্যের জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা যথাযথ পালন করা।

সমগ্র সৃষ্ট বস্তুর আনুগত্যশীল হওয়ার স্বরূপ ঃ সমগ্র সৃষ্টজগৎ স্রষ্টার আজ্ঞাধীন ও ইচ্ছাধীন। সৃষ্ট জগতের এই আজ্ঞানুবর্তিতা দুই প্রকার। (১) সৃষ্টিগত ব্যবস্থাপনার অধীনে বাধ্যতামূলক আনুগত্য। মুমিন, কাফির, জীবিত, মৃত, জড় পদার্থ ইত্যাদি কেউ এই আনুগত্যের আওতা-বহির্ভূত নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সবাই সমভাবে আল্লাহ্ তা'আলার আজ্ঞাধীন ও ইচ্ছাধীন। বিশ্ব-চরাচরের কোন কণা অথবা পাহাড় আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতিরেকে এতটুকুও নড়াচড়া করতে পারে না। (২) সৃষ্ট জগতের ইচ্ছাধীন আনুগত্য। অর্থাৎ স্ব-ইচ্ছায় আল্লাহ্ তা'আলার বিধানাবলী মেনে চলা। এতে মুমিন ও কাফিরের পার্থক্য আছে। যারা আনুগত্যশীল ফরমাবরদার, তারা মুমিন এবং যারা আনুগত্য বর্জন করে ও অস্বীকার করে, তারা কাফির। আয়াতে মুমিন ও কাফিরের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। এতেই বোঝা যায় যে, এখানে সিজদা ও আনুগত্য বলে শুধু সৃষ্টিগত আনুগত্য নয়; বরং ইচ্ছাধীন আনুগত্য বোঝানো হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হয় যে, ইচ্ছাধীন আনুগত্য তো শুধু বিবেকবান মানুষ, জিন ইত্যাদির মধ্যে হতে পারে। জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও জড় পদার্থের মধ্যে বিবেক ও চেতনাই নেই। এমতাবস্থায় এগুলোর মধ্যে ইচ্ছাধীন আনুগত্য কিভাবে হবে? এর উত্তর এই যে, কোরআন পাকের বহু আয়াত ও বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, বিবেক, চেতনা ও ইচ্ছা থেকে কোন সৃষ্ট বস্তুই মুক্ত নয়। সবার মধ্যেই কমবেশী এগুলো বিদ্যমান আছে। মানব ও জিন জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা বিবেক ও চেতনার একটি পূর্ণ স্তর দান করেছেন। এ কারণেই তাদেরকে আদেশ ও নিষেধের অধীন করা হয়েছে। অবশিষ্ট সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণী ও প্রকারকে সেই প্রকারের প্রয়োজন অনুযায়ী বিবেক ও চেতনা দেওয়া হয়েছে। মানব জাতিই সর্বাধিক বিবেক ও চেতনা লাভ করেছে। জন্তু-জানোয়ারের বিবেক ও চেতনা সাধারণত অনুভব করা হয়। উদ্ভিদের বিবেক ও চেতনাও সামান্য চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা চেনা যায়; কিন্তু জড় পদার্থের বিবেক ও চেতনা এতই অল্প ও লুক্কায়িত যে, সাধারণ মানুষ তা বুঝতেই পারে না। কিন্তু তাদের স্রষ্টা ও মালিক বলেছেন যে, তারাও

বিবেক ও চেতনার অধিকারী। কোরআন পাক আকাশ ও ভূমণ্ডল সম্পর্কে বলে যে, قَالَتَا اَتَيۡنَا طَائِعِيۡنَ ---অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীনকে আদেশ করলেনঃ তোমাদেরকে আমার আজ্ঞাবহ হতেই হবে। অতএব হয় স্বেচ্ছায় আনুগত্য অবলম্বন কর, না হয় বাধ্যতামূলকভাবেই অনুগত থাকতে হবে। উত্তরে আসমান ও যমীন আরয করলঃ আমরা স্বেচ্ছায় ও খুশীতে আনুগত্য কবুল করলাম। অন্যত্র পর্বতের প্রস্তর সম্পর্কে কোরআন পাক বলেঃ وَاِنَّ مِنۡهَا لَمَا يَهۡبِطُ مِنۡ خَشۡيَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ কতক প্রস্তর আল্লাহ্‌র ভয়ে ওপর থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ে। এমনিভাবে অনেক হাদীসে পর্বতসমূহের পারস্পরিক কথাবার্তা এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে বিবেক ও চেতনার সাক্ষ্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কাজেই আলোচ্য আয়াতে যে আনুগত্যকে সিজদা শব্দ দ্বারাই ব্যক্ত করা হয়েছে, তা ইচ্ছাধীন আনুগত্য। আয়াতের অর্থ এই যে, মানবজাতি ছাড়াও (জিনসহ) সব সৃষ্ট বস্তু স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে সিজদা করে অর্থাৎ আজ্ঞা পালন করে। শুধু মানব ও জিনই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে---এক. মু'মিন, অনুগত ও সিজদাকারী এবং দুই. কাফির, অবাধ্য ও সিজদার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী। সিজদার তওফীক না দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা শেষোক্ত দলকে হেয় করেছেন। واللّٰه اعلم

هٰذٰنِ خَصۡمٰنِ اخۡتَصَمُوۡا فِیۡ رَبِّهِمۡ ۫ فَالَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا قُطِّعَتۡ لَهُمۡ
ثِیَابٌ مِّنۡ نَّارٍ ؕ یُصَبُّ مِنۡ فَوۡقِ رُءُوۡسِهِمُ الۡحَمِیۡمُ ﴿۱۹﴾
یُصۡهَرُ بِهٖ مَا فِیۡ بُطُوۡنِهِمۡ وَ الۡجُلُوۡدُ ﴿۲۰﴾ وَ لَهُمۡ مَّقَامِعُ مِنۡ
حَدِیۡدٍ ﴿۲۱﴾ كُلَّمَاۤ اَرَادُوۡۤا اَنۡ یَّخۡرُجُوۡا مِنۡهَا مِنۡ غَمٍّ اُعِیۡدُوۡا فِیۡهَا ؕ
وَ ذُوۡقُوۡا عَذَابَ الۡحَرِیۡقِ ﴿۲۲﴾ اِنَّ اللّٰهَ یُدۡخِلُ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ یُحَلَّوۡنَ فِیۡهَا مِنۡ
اَسَاوِرَ مِنۡ ذَهَبٍ وَّ لُؤۡلُؤًا ؕ وَ لِبَاسُهُمۡ فِیۡهَا حَرِیۡرٌ ﴿۲۳﴾ وَ هُدُوۡۤا اِلَی
الطَّیِّبِ مِنَ الۡقَوۡلِ ۚۖ وَ هُدُوۡۤا اِلٰی صِرَاطِ الۡحَمِیۡدِ ﴿۲۴﴾

(১৯) এই দুই বাদী-বিবাদী, তারা তাদের পালনকর্তা সম্পর্কে বিতর্ক করে। অতএব যারা কাফির, তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরি করা হয়েছে। তাদের মাথার ওপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে। (২০) ফলে তাদের পেটে যা আছে, তা এবং চর্ম গলে বের হয়ে যাবে। (২১) তাদের জন্য আছে লোহার হাতুড়ি। (২২) তারা যখনই যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। বলা হবেঃ দহনশাস্তি আস্বাদন কর। (২৩) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে দাখিল করবেন উদ্যান-সমূহে যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তাদেরকে তথায় স্বর্ণ-কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমী। (২৪) তারা পথপ্রদর্শিত হয়েছিল সৎবাক্যের দিকে এবং পরিচালিত হয়েছিল প্রংশসিত আল্লাহ্র পথপানে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছিল) এরা দুই পক্ষ, (এক পক্ষ মুমিন অপর পক্ষ কাফির। এরপর কাফির দল কয়েক প্রকার---ইহুদী, খৃস্টান, সাবেয়ী, অগ্নিপূজারী) এরা এদের পালনকর্তা সম্পর্কে (বিশ্বাসগতভাবে এবং কোন কোন সময় তর্কক্ষেত্রেও) মতবিরোধ করে। (এই মতবিরোধের ফয়সালা কিয়ামতে এভাবে হবে যে,) যারা কাফির, তাদের (পরিধানের) জন্য আগুনের পোশাক তৈরি করা হবে (অর্থাৎ আগুন তাদের সমস্ত দেহকে পোশাকের ন্যায় ঘিরে ফেলবে) তাদের মাথার ওপর তীব্র ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে, যদ্দরুন তাদের পেটের বস্তুসমূহ (অর্থাৎ অন্ত্রসমূহ) ও চর্ম গলে যাবে। (অর্থাৎ এই ফুটন্ত পানির কিছু অংশ পেটের ভেতর চলে যাবে। ফলে অন্ত্র এবং পেটের অভ্যন্তরস্থ সব অঙ্গ গলে যাবে। কিছু অংশ ওপরে প্রবাহিত হবে। ফলে চর্ম গলে যাবে।) তাদের (মারার) জন্য লোহার গদা থাকবে। (এই বিপদ থেকে তারা কোন সময় মুক্তি পাবে না।) তারা যখনই (দোযখে) যন্ত্রণার কারণে (অস্থির হয়ে যাবে এবং) সেখান থেকে বের হতে চাইবে তখনই তথায় ফিরিয়ে দেয়া হবে। বলা হবেঃ দহন-শাস্তি (চির-কালের জন্য) তোমরা আস্বাদন করতে থাক (কখনও বের হতে পারবে না)। যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে (জান্নাতের) এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করবেন, যাদের তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। তাদেরকে তথায় স্বর্ণকংকন ও মোতি পরিধান করানো হবে এবং তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমের। (তাদের জন্য এসব পুরস্কার ও সম্মান এ কারণে যে, দুনিয়াতে) তারা কলেমায় তাইয়্যেবার দিকে পথ প্রদর্শিত হয়েছিল এবং প্রশংসিত আল্লাহ্র পথের পানে পরিচালিত হয়েছিল (এই পথ ইসলাম)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا আয়াতে উল্লেখিত দুই পক্ষ হচ্ছে সাধারণ মুমিনগণ এবং তাদের বিপরীতে সব কাফিরদল; ইসলামের যুগের হোক কিংবা পূর্ববর্তী যুগসমূহের। তবে এই আয়াত সেই দুই পক্ষ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বদরের রণক্ষেত্রে একে অপরের বিপক্ষে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। মুসলমানদের মধ্য থেকে হযরত আলী, হামযা, ওবায়দা (রা) ও কাফিরদের পক্ষ থেকে ওতবা ইবনে রবীয়া, তদীয় পুত্র ওলীদ ও তদীয় ভ্রাতা শায়বা এতে শরীক ছিল। তন্মধ্যে কাফির পক্ষে তিনজনই নিহত এবং মুসলমানদের মধ্য থেকে হযরত আলী ও হামযা অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন। ওবায়দা গুরুতর আহত অবস্থায় ফিরে এসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পায়ের কাছে প্রাণত্যাগ করেন। আয়াত যে এই সম্মুখ যোদ্ধাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, তা বুখারী ও মুসলিমের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। কিন্তু বাহ্যত এই হুকুম তাঁদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং সমগ্র উম্মতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—যে কোন যমানার উম্মত হোক না কেন।

জান্নাতীদেরকে কংকন পরিধান করানোর রহস্য ঃ এখানে সন্দেহ হয় যে, হাতে কংকন পরা নারীদের কাজ এবং এটা তাদেরই অলংকার। পুরুষদের জন্য একে দূষণীয় মনে করা হয়। উত্তর এই যে, মাথায় মুকুট এবং হাতে কংকন পরিধান করা পুরাকালের রাজা-বাদশাহ্দের একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রচলিত ছিল। হাদীসে বর্ণিত আছে, হিজরতের সফরে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে গ্রেফতার করার জন্য সুরাকা ইবনে মালেক অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়েছিল। আল্লাহ্র হুকুমে তার ঘোড়ার পা মাটিতে পুঁতে গেলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দোয়ায় ঘোড়াটি উদ্ধার পায়। সুরাকা ইবনে মালেক তওবা করায় রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে ওয়াদা দেন যে, পারস্য সম্রাট কিস্রার কংকন যুদ্ধলব্ধ মালের সাথে মুসলমানদের হস্তগত হলে তাকে তা দান করা হবে। অতঃপর হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফতকালে যখন পারস্য বিজিত হয় এবং সম্রাটের কংকন অন্যান্য মালের সাথে আগমন করে, তখন সুরাকা ইবনে মালেক তা দাবী করে বসে এবং তাকে তা প্রদানও করা হয়। মোটকথা, সাধারণ পুরুষের মধ্যে যেমন মাথায় মুকুট পরিধান করার প্রচলন নেই, এটা রাজকীয় ভূষণ, তেমনি হাতে কংকন পরিধান করাকেও রাজকীয় ভূষণ মনে করা হয়। তাই জান্নাতীদেরকে কংকন পরিধান করানো হবে। কংকন সম্পর্কে এই আয়াতে এবং সূরা ফাতিরে বলা হয়েছে যে, তা স্বর্ণ নির্মিত হবে; কিন্তু সূরা নিসায় রৌপ্য নির্মিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তফসীরকারগণ বলেন ঃ জান্নাতীদের হাতে তিন রকম কংকন পরানো হবে—স্বর্ণ নির্মিত, রৌপ্য নির্মিত এবং মোতি নির্মিত। এই আয়াতে মোতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।—(কুরতুবী)

রেশমী পোশাক পুরুষদের জন্য হারাম ঃ আলোচ্য আয়াতে আছে যে, জান্নাতীদের পোশাক রেশমের হবে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের সমস্ত পরিচ্ছদ, বিছানা, পর্দা ইত্যাদি

রেশমের হবে। রেশমী বস্ত্র দুনিয়াতে সর্বোত্তম গণ্য হয়। বলা বাহুল্য, জান্নাতের রেশমের উৎকৃষ্টতার সাথে দুনিয়ার রেশমের মান কোন অবস্থাতেই তুল্য নয়।

ইমাম নাসায়ী, বাযযায ও বায়হাকী আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ জান্নাতীদের রেশমী পোশাক জান্নাতের ফলের ভেতর থেকে বের হবে। হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে আছেঃ জান্নাতের একটি বৃক্ষ থেকে রেশম উৎপন্ন হবে। জান্নাতীদের পোশাক এই রেশম দ্বারাই তৈরী হবে। ---(মাযহারী)

ইমাম নাসায়ী হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ

من لبس الحرير فى الد نيا لم يلبسه فى الاخرة و من شرب الخمر فى الد نيا لم يشربها فى الا خرة و من شرب فى أ نية الذ هب و الفضة لم يشرب فيها فى الا خرة ثم قا ل ر سو ل الله صلى الله عليه و سلم لبا س ا هل الجنة و شرا ب ا هل الجنة و ا نية ا هل الجنة -

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, সে পরকালে তা পরিধান করবে না। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্য পান করবে, সে পরকালে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করবে, সে পরকালে এসব পাত্রে পানাহার করবে না। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ এই বস্তুত্রয় জান্নাতীদের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট।---(কুরতুবী)

উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এসব কাজ করে এবং তওবা না করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করলেও এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকবে; যেমন আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্যপান করে তওবা করে না, সে পরকালে জান্নাতের মদ থেকে বঞ্চিত হবে।---(কুরতুবী)

অন্য এক হাদীসে আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ

من لبس الحرير فى الد نيا لم يلبسه فى الا خرة و ان د خل الجنة لبسه ا هل الجنة و لم يلبسه هوا

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশম পরিধান করে, সে পরকালে তা পরিধান করবে না, যদিও সে জান্নাতে প্রবেশ করে। অন্যান্য জান্নাতী রেশম পরিধান করবে; কিন্তু সে পরিধান করতে পারবে না।---(কুরতুবী)

এখানে সন্দেহ হতে পারে যে, যখন তাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে, তখন কোন বস্তু থেকে বঞ্চিত রাখলে তার মনে দুঃখ ও পরিতাপ থাকবে। অথচ জান্নাত দুঃখ

ও পরিতাপের স্থান নয়। সেখানে কারও মনে বিষাদ ও আফসোস থাকা উচিত নয়। যদি আফসোস না হয়, তবে এই বঞ্চিত করায়ও কোন উপকারিতা নেই। কুরতুবী এর চমৎকার জওয়াব দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ জান্নাতীদের স্থান ও স্তর বিভিন্নরূপ হবে। কেউ উপরের স্তরে এবং কেউ নিম্ন স্তরে থাকবে। স্তরের এই ব্যবধান ও পার্থক্য সবাই অনুভবও করবে। কিন্তু সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদের অন্তর এমন করে দেবেন যে, তাতে কোন কিছুর পরিতাপ ও আফসোস থাকবে না। و الله اعلم

وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ---হযরত ইবনে আব্বাস বলেনঃ এখানে কলেমায়ে তাইয়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বোঝানো হয়েছে।---(কুরতুবী) বিশুদ্ধ উক্তি এই যে, এখানে এ সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ۚ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

(২৫) যারা কুফর করে ও আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং সেই মসজিদে হারাম থেকে বাধা দেয়, যাকে আমি প্রস্তুত করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সকল মানুষের জন্য সমভাবে এবং যে মসজিদে হারামে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছা করে, আমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় যারা কাফির হয়েছে এবং (মুসলমানদেরকে) আল্লাহ্‌র পথে এবং মসজিদে হারাম থেকে বাধা দেয় (যাতে মুসলমানরা ওমরাহ্ ব্রত পালন না করতে পারে; অথচ হেরেম শরীফে কারও একচেটিয়া অধিকার নেই; বরং) আমি একে সব মানুষের জন্য রেখেছি। এতে সবাই সমান---এর সীমানায় বসবাসকারীও (অর্থাৎ যারা স্থানীয়) এবং বহিরাগত (মুসাফির)ও, এবং যে কেউ এতে (অর্থাৎ হেরেম শরীফে) অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছা করে, আমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতে মুমিন ও কাফির দুই পক্ষের বিতর্কের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এই বিতর্কেরই একটি বিশেষ প্রকার এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই

যে, কোন কোন কাফির এমনও আছে, যারা নিজেরা গোমরাহীতে অটল এবং অন্য-দেরকেও আল্লাহ্র পথে চলতে বাধা দান করে। এ ধরনের লোকেরাই রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীদেরকে ওমরার ইহ্রাম বেঁধে মসজিদে-হারামে প্রবেশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। অথচ মসজিদে-হারাম ও হেরেম শরীফের ইবাদত, ওমরা ও হজ্ব সম্পর্কিত অংশ তাদের মালিকানায় ছিল না। ফলে কোনরকম বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অধিকার তাদের ছিল না। বরং এসব জায়গা সব মানুষের জন্য সমান ছিল। এখানে হেরেমের অধিবাসী, বহিরাগত মুসাফির, শহরবাসী এবং বিদেশী সবার সমান অধিকার ছিল। এরপর তাদের শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মসজিদে-হারামে (অর্থাৎ গোটা হেরেম শরীফে) কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করবে; যেমন মানুষকে হেরেমে প্রবেশ করতে বাধা দেয়া অথবা অন্য কোন ধর্মবিরোধী কাজ করা, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করানো হবে; বিশেষ করে যখন ধর্মবিরোধী কাজের সাথে জুলুম অর্থাৎ শিরকও মিলিত থাকে। মক্কার মুশরিকদের অবস্থা তদ্রূপই ছিল। তারা মুসলমানদেরকে হেরেমে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিল। তাদের এ কাজও ধর্ম বিরোধী ও অবৈধ ছিল, এর সাথে তারা কুফর ও শিরকেও লিপ্ত ছিল। যদিও ধর্মবিরোধী কাজ বিশেষত শিরক ও কুফর সর্বত্র ও সর্বকালে হারাম, চূড়ান্ত অপরাধ ও শাস্তির কারণ; কিন্তু যারা এরূপ কাজ হেরেমের অভ্যন্তরে করে, তাদের অপরাধ দ্বিগুণ হয়ে যায়। তাই এখানে বিশেষভাবে হেরেমের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ — سَبِيْلِ اللّٰهِ (আল্লাহ্র পথ) বলে ইসলাম বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা নিজেরা তো ইসলাম থেকে দূরে সরে আছেই; অন্যদেরকেও ইসলাম থেকে বাধা দেয়।

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ —— এটা তাদের দ্বিতীয় গোনাহ্। তারা মুসলমানদেরকে মসজিদে-হারামে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। 'মসজিদে-হারাম' ঐ মসজিদকে বলা হয়, যা বায়তুল্লাহ্র চতুষ্পার্শ্বে নির্মিত হয়েছে। এটা মক্কার হেরেম শরীফের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু কোন কোন সময় মসজিদে-হারাম বলে মক্কার সম্পূর্ণ হেরেম শরীফ বোঝানো হয়; যেমন আলোচ্য ঘটনাতেই মক্কার কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শুধু মসজিদে-হারামে প্রবেশে বাধা দেয়নি; বরং হেরেমের সীমানায় প্রবেশ করতে বাধা দান করেছিল। সহীহ্ হাদীস দ্বারা তাই প্রমাণিত রয়েছে। কোরআন পাক এ ঘটনায় মসজিদে-হারাম শব্দটি সাধারণ হেরেমের অর্থে ব্যবহার করেছে এবং বলেছে: وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

তফসীরে দুররে-মনসুরে এ স্থলে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা করা হয়েছে যে, আয়াতে মসজিদে-হারাম বলে হেরেম শরীফ বোঝানো হয়েছে।

মক্কার হেরেমে সব মুসলমানের সমান অধিকারের তাৎপর্যঃ মসজিদে-হারাম ও হেরেম শরীফের যে যে অংশে হজ্বের ক্রিয়াকর্ম পালন করা হয়---যেমন সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান, মিনার, সমগ্র ময়দান, আরাফাতের সম্পূর্ণ ময়দান এবং মুযদালেফার গোটা ময়দান। এসব ভূখণ্ড সারা বিশ্বের মুসলমানের জন্য সাধারণ ওয়াকফ। কোন ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিগত মালিকানা এগুলোর ওপর কখনও হয়নি এবং হতেও পারে না। এ বিষয়ে সমগ্র উম্মত ও ফিকাহ্বিদগণ একমত। এগুলো ছাড়া মক্কা মুকার-রমার সাধারণ বাসগৃহ এবং হেরেমের অবশিষ্ট ভূখণ্ড সম্পর্কেও কোন কোন ফিকাহ্বিদ বলেন যে, এগুলোও সাধারণ ওয়াকফ সম্পত্তি। এগুলো বিক্রয় করা ও ভাড়া দেওয়া হারাম। প্রত্যেক মুসলমান যে কোন স্থানে অবস্থান করতে পারে। তবে অধিক সংখ্যক ফিকাহ্বিদের উক্তি এই যে, মক্কার বাসগৃহসমূহের ওপর ব্যক্তি বিশেষের মালিকানা হতে পারে। এগুলো ক্রয়-বিক্রয় করা ও ভাড়া দেওয়া জায়েয। হযরত উমর ফারূক (রা) থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার বাসগৃহ ক্রয় করে কয়েদীদের জন্যে জেলখানা নির্মাণ করেছিলেন। ইমাম আজম আবু হানীফা (র) থেকে এ ব্যাপারে উপরোক্ত উভয় প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। কিন্তু ফতওয়া শেষোক্ত উক্তি অনুযায়ী। (রূহুল মা'আনী) ফিকাহ্ গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে হেরেমের যে অংশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সর্বাবস্থায় সাধারণ ওয়াকফ। এগুলোতে প্রবেশে বাধা দেওয়া হারাম। আলোচ্য আয়াত থেকে এই অবৈধতা প্রমাণিত হয়। واللہ اعلم

وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ—অভিধানে الحاد-এর অর্থ সরল পথ থেকে সরে যাওয়া। এখানে 'এলহাদের' অর্থ মুজাহিদ ও কাতাদহর মতে কুফর ও শিরক। কিন্তু অন্য তফসীরকারগণ একে সাধারণ অর্থে রেখেছেন। ফলে প্রত্যেক গোনাহ্ ও আল্লাহ্র নাফরমানী এর অন্তর্ভুক্ত। এমন কি, চাকরকে গালি দেওয়া এবং মন্দ বলাও। এই অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেই হযরত আতা বলেনঃ 'হেরেমে এলহাদ' বলে এহ্রাম ব্যতীত হেরেমে প্রবেশ করা এবং হেরেমে নিষিদ্ধ---এমন কোন কাজ করাকে বোঝানো হয়েছে। যেমন হেরেমে শিকার করা কিংবা হেরেমে কোন বৃক্ষ কর্তন করা ইত্যাদি। যেসব কাজ শরীয়তে নিষিদ্ধ, সেগুলো সর্বত্রই গোনাহ্ এবং আযাবের কারণ। তবে বিশেষ করে হেরেমের কথা বলার কারণ এই, মক্কার হেরেমে সৎ কাজের সওয়াব যেমন অনেক বেশি হয় তেমনি পাপ কাজের আযাবও বহুলাংশে বেড়ে যায়। ---(মুজাহিদের উক্তি)।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) থেকে এই আয়াতের এক তফসীর এরূপও বর্ণিত আছে যে, হেরেম শরীফ ছাড়া অন্যত্র পাপ কাজের ইচ্ছা করলেই পাপ লিখা হয়

না, যতক্ষণ তা কার্যে পরিণত করা না হয় ; কিন্তু হেরেমে শুধু পাকাপোক্ত ইচ্ছা করলেই গোনাহ লিখা হয়। কুরতুবী এই তফসীরই হযরত ইবনে উমর (রা) থেকেও বর্ণনা করেছেন এবং একে বিশুদ্ধ বলেছেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর হজ্ব করতে গেলে দুটি তাঁবু স্থাপন করতেন---একটি হেরেমের অভ্যন্তরে এবং অপরটি বাইরে। যদি পরিবার-বর্গ অথবা চাকর-নওকরদের মধ্যে কাউকে কোন কারণে শাসন করার প্রয়োজন হত তবে তিনি হেরেমের বাইরের তাঁবুতে যেয়ে এ কাজ করতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বলেন ঃ আমাদেরকে ইহা বলা হয়েছে যে, মানুষ ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির সময় كلا و الله অথবা بلى و الله ইত্যাদি যেসব বাক্য উচ্চারণ করে, এগুলোও হেরেমের অভ্যন্তরে 'এলহাদ' করার শামিল।---(মাযহারী)

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

(২৬) যখন আমি ইবরাহীমকে বায়তুল্লাহ্র স্থান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখ তওয়াফ-কারীদের জন্য, নামাযে দণ্ডায়মানদের জন্য এবং রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য। (২৭) এবং মানুষের মধ্যে হজ্বের জন্য ঘোষণা প্রচার কর। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে। (২৮) যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থান পর্যন্ত পৌঁছে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করে তার দেওয়া চতুষ্পদ জন্তু যবেহ্ করার সময়। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার কর এবং দুস্থ অভাবগ্রস্তকে আহার করাও। (২৯) এরপর তারা যেন দৈহিক ময়লা দূর করে দেয়, তাদের মানত পূর্ণ করে এবং এই সুসংরক্ষিত গৃহের তওয়াফ করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (ঐ ঘটনা স্মরণ করুন) যখন আমি ইবরাহীম (আ)-কে কাবা গৃহের স্থান বলে দেই (কেননা, তখন কা'বাগৃহ নির্মিত ছিল না এবং আদেশ দেই) যে (এই গৃহকে ইবাদতের জন্য তৈরী কর এবং এই ইবাদতে) আমার সাথে কাউকে শরীক করো না। (প্রকৃতপক্ষে একথা তাঁর পরবর্তী লোকদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য ছিল। বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের সাথে শিরক নিষিদ্ধ করার এক কারণ এটাও যে, বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করে নামায এবং এর তওয়াফ থেকে কোন মূর্খ যেন একথা না বোঝে যে, এটাই মাবূদ।) এবং আমার গৃহকে তওয়াফকারী এবং (নামাযে) কিয়াম ও রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা অর্থাৎ কুফর ও শিরক থেকে) পবিত্র রাখ [এটাও প্রকৃতপক্ষে অপরকেও শোনানো উদ্দেশ্য ছিল। ইবরাহীম (আ) দ্বারা এর বিরুদ্ধাচরণের সম্ভাবনাই ছিল না।] এবং [ইবরাহীম (আ)-কে আরও বলা হল যে,] মানুষের মধ্যে হজ্জের (অর্থাৎ হজ্জ ফরয হওয়ার) ঘোষণা করে দাও। (এই ঘোষণার ফলে) তারা তোমার কাছে (অর্থাৎ তোমার এই পবিত্র গৃহের আঙিনায়) চলে আসবে পায়ে হেঁটে এবং (দূরত্বের কারণে পরিশ্রান্ত) উটের পিঠে সওয়ার হয়েও, সে উটগুলো দূর-দূরান্ত থেকে পৌঁছবে। (তারা এজন্য আসবে) যাতে তারা তাদের (ইহলৌকিক) কল্যাণের জন্য উপস্থিত হয়। (পারলৌকিক কল্যাণ তো প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত; যদি ইহলৌকিক কল্যাণও উদ্দেশ্য হয়, যেমন ক্রয়-বিক্রয়, কোরবানীর গোশত প্রাপ্তি ইত্যাদি, তবে তাও নিন্দনীয় নয়।) এবং (এজন্য আসবে, যাতে) নির্দিষ্ট দিনগুলোতে (কোরবানীর দিন দশ থেকে বারই যিলহজ্জ পর্যন্ত) সেই বিশেষ চতুষ্পদ জন্তুগুলোর উপর (কোরবানীর জন্তু যবেহ্ করার সময়) আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে, যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দিয়েছেন। [ইবরাহীম (আ)-কে বলার বিষয়বস্তু শেষ হয়েছে। অতঃপর উম্মতে মুহাম্মদীকে বলা হচ্ছে) তা থেকে (অর্থাৎ কোরবানীর জন্তুগুলো থেকে) তোমরাও আহার কর (এটা জায়েয এবং মুস্তাহাব এই যে,) দুঃখী অভাবগ্রস্তকেও আহার করাও। এরপর (কোরবানীর পর) তারা যেন নিজেদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে দেয় (অর্থাৎ ইহ্রাম খুলে মাথা মুণ্ডায়,) ওয়াজিব কর্মসমূহ (মানত দ্বারা কোরবানী ইত্যাদি ওয়াজিব করে থাকুক কিংবা মানত ছাড়াই হজ্জের যেসব ওয়াজিব কর্ম আছে, সেগুলো সব) পূর্ণ করে এবং এই নিরাপদ ও সংরক্ষিত গৃহের (অর্থাৎ বায়তুল্লাহ্র) তওয়াফ করে। (একে তওয়াফে-যিয়ারত বলা হয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এর আগের আয়াতে মসজিদে-হারাম ও হেরেম শরীফে প্রবেশের পথে বাধাদান-কারীদের প্রতি কঠোর শাস্তির বাণী উচ্চারিত হয়েছে। এর সাথে সম্পর্ক রেখে এখন বায়তুল্লাহর বিশেষ ফযিলত ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হচ্ছে, যাতে তাদের দুষ্কর্ম আরও অধিক ফুটে ওঠে।

বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের সূচনা ঃ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ

অভিধানে بَوَّأَ শব্দের অর্থ কাউকে ঠিকানা ও বসবাসের গৃহ দেওয়া। আয়াতের অর্থ এই ঃ একথা উল্লেখযোগ্য ও স্মর্তব্য যে, আমি ইবরাহীমকে বায়তুল্লাহ্র অবস্থান স্থলের ঠিকানা দিয়েছি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ইবরাহীম (আ) পূর্ব থেকে এই ভূখণ্ডে বসবাস করতেন না। বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত আছে যে, তাঁকে সিরিয়া থেকে হিজরত করিয়ে এখানে আনা হয়েছিল। مكان البيت শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বায়তুল্লাহ্ ইবরাহীম (আ)-এর আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, এর প্রথম নির্মাণ আদম (আ)-কে পৃথিবীতে আনার পূর্বে অথবা সাথে সাথে হয়েছিল। আদম (আ) ও তৎপরবর্তী পয়গম্বরগণ বায়তুল্লাহ্র তওয়াফ করতেন। নূহ্ (আ)-এর তূফানের সময় বায়তুল্লাহ্র প্রাচীর উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তবে ভিত্তি ও নির্দিষ্ট জায়গা বিদ্যমান ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ)-কে এই জায়গার কাছেই পুনর্বাসিত করা হয় এবং আদেশ দেওয়া হয় ঃ أَنْ لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا অর্থাৎ আমার ইবাদতে কাউকে শরীক করো না। বলাবাহুল্য, হযরত ইবরাহীম (আ) শিরক করবেন, এরূপ কল্পনাও করা যায় না। তাঁর মূর্তি সংহার, মুশরিকদের মুকাবিলা এবং এই ব্যাপারে কঠিন অগ্নিপরীক্ষার ঘটনাবলী পূর্বেই ঘটে গিয়েছিল। তাই এখানে সাধারণ মানুষকে শোনানোর উদ্দেশ্য, যাতে তারা শিরক না করে। দ্বিতীয় আদেশ এরূপ দেওয়া হয় وَطَهِّرْ بَيْتِيَ আমার গৃহকে পবিত্র রাখ। তখন গৃহ বিদ্যমান ছিল না ; কিন্তু বায়তুল্লাহ্ প্রকৃতপক্ষে প্রাচীরের নাম নয় ; বরং যে পবিত্র ভূখণ্ডে প্রথম বায়তুল্লাহ্ নির্মাণ করা হয়েছিল এবং এখন পুনরায় নির্মাণের আদেশ করা হচ্ছে, তাকেই বায়তুল্লাহ্ বলা হয়। এই ভূখণ্ড সব সময় বিদ্যমান ছিল। একে পবিত্র করার আদেশ দানের কারণ এই যে, সে সময়ও জুরহাম ও আমালিকা গোত্র এখানে কিছু মূর্তি স্থাপন করে রেখেছিল। তারা এসব মূর্তির পূজা করত।---(কুরতুবী) এটাও সম্ভবপর যে, এই আদেশটি পরবর্তী লোকদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য। পবিত্র করার অর্থ কুফর ও শিরক থেকেও পবিত্র রাখা। বাহ্যিক ময়লা-আবর্জনা থেকেও পবিত্র রাখা। ইবরাহীম (আ)-কে একথা বলার উদ্দেশ্য অন্য লোকদেরকে এ ব্যাপারে সচেষ্ট করা। কারণ ইবরাহীম (আ) নিজেই এ কাজ করতেন। এতদসত্ত্বেও যখন তাঁকে ঐ কাজ করতে বলা হয়েছে, তখন অন্যদের এ ব্যাপারে কতটুকু যত্নবান হওয়া উচিত, তা সহজেই অনুমেয়।

ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি তৃতীয় আদেশ এই ঃ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে, বায়তুল্লাহ্‌র হজ্ব তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে।---(বগভী) ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন ইবরাহীম (আ)-কে হজ্ব ফরয হওয়ার কথা ঘোষণা করার আদেশ দেওয়া হয়, তখন তিনি আল্লাহ্‌র কাছে আরয করলেন ঃ এখানে তো জনমানবহীন বন্য প্রান্তর। ঘোষণা শোনার মত কেউ নেই; যেখানে জনবসতি আছে, সেখানে আমার আওয়াজ কিভাবে পৌঁছবে? আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ তোমার দায়িত্ব শুধু ঘোষণা করা। সারা বিশ্বে পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার। ইবরাহীম (আ) মকামে-ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তা উচ্চ করে দেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তিনি আবূ কুবায়স পাহাড়ে আরোহণ করে ঘোষণা করেন। দুই কানে অঙ্গুলি রেখে ডানে-বামে এবং পূর্ব-পশ্চিমে মুখ করে বললেন ঃ 'লোকসকল! তোমাদের প্রতিপালক নিজের গৃহ নির্মাণ করেছেন এবং তোমাদের উপর এই গৃহের হজ্ব ফরয করেছেন। তোমরা সবাই পালনকর্তার আদেশ পালন কর।' এই রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ)-এর এই আওয়াজ আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বের কোণায় কোণায় পৌঁছিয়ে দেন এবং শুধু তখনকার জীবিত মানুষ পর্যন্তই নয়; বরং ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আগমনকারী ছিল, তাদের সবার কান পর্যন্ত এই আওয়াজ পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। যার যার ভাগ্যে আল্লাহ্ তা'আলা হজ্ব লিখে দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকেই এই আওয়াজের জওয়াবে لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ বলেছে অর্থাৎ হাযির হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ ইবরাহীমী আওয়াজের জওয়াবই হচ্ছে হজ্বে 'লাব্বায়কা' বলার আসল ভিত্তি।---(কুরতুবী, মাযহারী)

অতঃপর আয়াতে সেই প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে, যা ইবরাহীম (আ)-এর ঘোষণাকে সব মানবমণ্ডলী পর্যন্ত পৌঁছানোর কারণে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য কায়েম হয়ে গেছে। তা এই যে, يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ অর্থাৎ বিশ্বের প্রতিটি প্রত্যন্ত এলাকা থেকেও মানুষ বায়তুল্লাহ্‌র দিকে চলে আসবে; কেউ পদব্রজে, কেউ সওয়ার হয়ে। যারা সওয়ার হয়ে আসবে, তারাও দূর-দূরান্ত দেশ থেকে আগমন করবে। ফলে তাদের সওয়ারীর জন্তুগুলো কৃশকায় হয়ে যাবে। এই ঘোষণার দিন থেকে আজ পর্যন্ত হাজারো বছর অতীত হয়ে গেছে, বায়তুল্লাহ্‌র পানে আগমনকারীদের অবস্থা অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। পরবর্তী পয়গম্বরগণ এবং তাঁদের উম্মতও এই আদেশের অনুসারী ছিলেন। ঈসা (আ)-র পর যে সুদীর্ঘ জাহেলিয়াতের যুগ অতিবাহিত হয়েছে, তাতে আরবের বাসিন্দারা মূর্তিপূজায় লিপ্ত

থাকা সত্ত্বেও হজ্বের বিধান তেমনিভাবে পালন করেছে, যেমন ইবরাহীম (আ) থেকে বর্ণিত ছিল।

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ---অর্থাৎ দূর-দূরান্ত পথ অতিক্রম করে তাদের এই উপস্থিতি তাদেরই উপকারের নিমিত্ত। এখানে منافع শব্দটি نكرة ব্যবহার করে ব্যাপক অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ধর্মীয় উপকার তো অসংখ্য আছেই; পার্থিব উপকারও অনেক প্রত্যক্ষ করা হয়। কমপক্ষে এতটুকু বিষয় স্বয়ং বিস্ময়কর যে, হজ্বের সফরে বিরাট অঙ্কের টাকা ব্যয়িত হয়, যা কেউ কেউ সারা জীবন পরিশ্রম করে অল্প অল্প করে সঞ্চয় করে এবং এখানে একই সময়ে ব্যয় করে ফেলে; কিন্তু সারা বিশ্বের ইতিহাসে কোথাও এরূপ ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয় না যে, কোন ব্যক্তি হজ্ব অথবা ওমরায় ব্যয় করার কারণে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত হয়ে গেছে; এ ছাড়া অন্যান্য কাজে যেমন বিয়ে-শাদীতে, গৃহনির্মাণে টাকা ব্যয় করে নিঃস্ব ও ফকীর হওয়া হাজারো মানুষ যত্রতত্র দৃষ্টিগোচর হয়। আল্লাহ্ তা'আলা হজ্ব ও ওমরার সফরে এই বৈশিষ্ট্যও নিহিত রেখেছেন যে, এতে কোন ব্যক্তি পার্থিব দারিদ্র্য ও উপবাসের সম্মুখীন হয় না। বরং কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, হজ্ব-ওমরায় ব্যয় করলে দারিদ্র ও অভাবগ্রস্ততা দূর হয়ে যায়। চিন্তা করলে এ বিষয়টিও সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা যাবে। হজ্বের ধর্মীয় কল্যাণ তো অনেক; তন্মধ্যে নিম্নে বর্ণিত একটি কল্যাণ কোন অংশে কম নয়। আবূ হুরায়রার এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য হজ্ব করে এবং তাতে অশ্লীল ও গোনাহর কার্যাদি থেকে বেঁচে থাকে, সে হজ্ব থেকে এমতাবস্থায় ফিরে আসে যেন আজই মায়ের গর্ভ থেকে বের হয়েছে; অর্থাৎ জন্মের প্রথমাবস্থায় শিশু যেমন নিষ্পাপ থাকে, সে-ও তদ্রূপই হয়ে যায়।---(বুখারী, মুসলিম---মাযহারী)

বায়তুল্লাহ্র কাছে হাজীদের আগমনের এক উপকার তো উপরে বর্ণিত হল যে, তারা তাদের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ প্রত্যক্ষ করবে। দ্বিতীয় উপকার এরূপ বর্ণিত হয়েছে---وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ অর্থাৎ যাতে নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে সেই সব জন্তুর উপর, যেগুলো আল্লাহ্ তাদেরকে দিয়েছেন। এতে প্রথম জরুরী কথা এই যে, কোরবানীর গোশত ও তা থেকে অর্জিত উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য না থাকা উচিত; বরং আসল বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্র যিকর, যা এই দিনগুলোতে কোরবানী করার সময় জন্তুদের উপর করা হয়। এটাই ইবাদতের প্রাণ। কোরবানীর গোশত তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। এটা বাড়তি নিয়ামত। 'নির্দিষ্ট দিনগুলো' বলে সেই দিনগুলো বোঝানো হয়েছে, যেগুলোতে কোরবানী করা জায়েয;

অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখ। مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ—এর অর্থ ব্যাপক; ওয়াজিব হোক কিংবা মুস্তাহাব সব রকম কোরবানী এর অন্তর্ভুক্ত।

فَكُلُوا مِنْهَا—এখানে كلوا শব্দটি আদেশসূচক পদ হলেও অর্থ ওয়াজিব করা নয়; বরং অনুমতি দান ও বৈধতা প্রকাশ করা; যেমন কোরআনের وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا আয়াতে শিকারের আদেশ অনুমতিদানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মাস'আলা ঃ হজ্বের মওসুমে মক্কা মুয়াযযমায় বিভিন্ন প্রকার জন্তু যবেহ্ করা হয়। কোন অপরাধের শাস্তি হিসেবে এক প্রকার জন্তুর কোরবানী ওয়াজিব হয়ে থাকে; যেমন কেউ হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে শিকার করলে এর প্রতিদানে তার ওপর কোন জন্তুর কোরবানী ওয়াজিব হয়। শিকারকৃত কোন্ জন্তুর পরিবর্তে কোন্ ধরনের জন্তু কোরবানী করতে হবে, তার বিস্তারিত বিবরণ ফিকার গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। এমনি-ভাবে ইহ্রাম অবস্থায় যেসব কাজ নিষিদ্ধ, কেউ সেরূপ কোন কাজ করে ফেললে তার উপরও জন্তু কোরবানী করা ওয়াজিব হয়ে যায়। ফিকাহ্বিদগণের পরিভাষায় এরূপ কোরবানীকে 'দমে-জিনায়াত' (ত্রুটিজনিত কোরবানী) বলা হয়। কোন কোন নিষিদ্ধ কাজ করলে গরু অথবা উট কোরবানী করা জরুরী হয়, কোন কোন কাজের জন্য ছাগল-ভেড়াই যথেষ্ট হয় এবং কোন কোন নিষিদ্ধ কাজের জন্য কোরবানী ওয়াজিব হয় না, শুধু সদকা দিলেই চলে। এসব বিবরণ পেশ করার স্থান এটা নয়। অধমের বিরচিত 'আহকামুল-হজ্ব' পুস্তিকায় প্রয়োজনীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ত্রুটি ও অপরাধের শাস্তি হিসেবে যে কোরবানী ওয়াজিব হয়, তার গোশত খাওয়া অপরাধী ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়; বরং এটা শুধু ফকির-মিসকীনদের হক। অন্য কোন ধনী ব্যক্তির জন্যও তা খাওয়া জায়েয নয়। এ ব্যাপারে সব ফিকাহ্বিদ একমত। কোরবানীর অবশিষ্ট প্রকার ওয়াজিব হোক কিংবা নফল সেগুলোর মাংস কোরবানীকারী নিজে, তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ধনী হলেও খেতে পারে। হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ীদের মতে "তামাত্তু ও কেরানের" কোরবানীও ওয়াজিব কোরবানীর অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য আয়াতে অবশিষ্ট প্রকার কোরবানীই বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ফিকাহ্ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সাধারণ কোরবানী এবং হজ্বের কোরবানীসমূহের গোশ্ত কোরবানীকারী নিজে ও ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব মুসলমান খেতে পারে। কিন্তু কমপক্ষে গোশতের তিন ভাগের এক ভাগ ফকির-মিসকীনকে দান করা মুস্তাহাব। এই মুস্তাহাব আদেশই আয়াতের পরবর্তী বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

بَائِس—وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ শব্দের অর্থ দুঃস্থ এবং فقير এর অর্থ অভাবগ্রস্ত। উদ্দেশ্য এই যে, কোরবানীর গোশ্‌ত তাদেরকেও আহার করানো ও দেওয়া মুস্তাহাব ও কাম্য।

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ—تفث-এর আভিধানিক অর্থ ময়লা, যা মানুষের দেহে জমা হয়। ইহ্‌রাম অবস্থায় মাথা মুণ্ডানো, কাটা, উপড়ানো, নখ কাটা, সুগন্ধি ব্যবহার করা ইত্যাদি হারাম। তাই এগুলোর নিচে ময়লা জমা হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, হজ্জের কোরবানী সমাপ্ত হলে দেহের ময়লা দূর করে দাও। অর্থাৎ ইহ্‌রাম খুলে ফেল, মাথা মুণ্ডাও এবং নখ কাট। নাভীর নিচের চুলও পরিষ্কার কর। আয়াতে প্রথমে কোরবানী ও পরে ইহ্‌রাম খোলার কথা বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, এই ক্রম অনুযায়ীই করা উচিত। কোরবানীর পূর্বে নখ কাটা, মাথা মুণ্ডানো ইত্যাদি নিষিদ্ধ। কেউ এরূপ করলে তাকে ত্রুটি জনিত কোরবানী করতে হবে।

হজ্জের ক্রিয়াকর্মে ক্রমের গুরুত্ব ঃ হজ্জের ক্রিয়াকর্মের যে ক্রম কোরআন ও হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, ফিকাহ্‌বিদগণ তা বিন্যস্ত করেছেন। এই ক্রম অনুযায়ী হজ্জের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করা সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নত ; ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিকের মতে ওয়াজিব। এর বিরুদ্ধাচরণ করলে ত্রুটিজনিত কোরবানী ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ীর মতে সুনত। কাজেই বিরুদ্ধাচরণ করলে সওয়াব হ্রাস পায়, কোরবানী ওয়াজিব হয় না। হযরত ইবনে আব্বাসের হাদীসে আছে ঃ من قدم شيئا من نسكه او اخره فليهرق دما অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজ্জের ক্রিয়াকর্মের মধ্যে কোনটিকে অগ্রে অথবা পশ্চাতে নিয়ে যায়, তার উপর কোরবানী করা ওয়াজিব। ইমাম তাহাভীও এই রেওয়ায়েতটি বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন এবং সায়ীদ ইবনে জুবায়র, কাতাদাহ্‌, নখয়ী ও হাসান বসরীর মাযহাবও তাই। তফসীরে-মাযহারীতে এই মাস'আলার পূর্ণ বিবরণ ও বিশদ আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। তাছাড়া হজ্জের অন্যান্য মাস'আলাও বর্ণিত হয়েছে।

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ—نذر শব্দটি-এর বহুবচন। এর অর্থ মানত। এর স্বরূপ এই যে, শরীয়তের আইনে যে কাজ কোন ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব নয়, যদি সে মুখে মানত করে যে, আমি এ কাজ করব অথবা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার জন্য এ কাজ করা জরুরী, তবে একেই নজর বা মানত বলা হয়। একে পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায় যদিও মূলত তা ওয়াজিব ছিল না। তবে এর ওয়াজিব হওয়ার জন্য কাজটি গোনাহ্‌ ও নাজায়েয না হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে শর্ত। যদি কেউ কোন গোনাহর কাজের মানত

করে, তবে সেই গোনাহর কাজ করা তার ওপর ওয়াজিব নয়; বরং বিপরীত করা ওয়াজিব। তবে কসমের কাফফারা আদায় করা জরুরী হবে। আবূ হানীফা (র) প্রমুখ ফিকাহবিদের মতে কাজটি উদ্দিষ্ট ইবাদত জাতীয় হওয়াও শর্ত; যেমন নামায, রোযা, সদকা, কোরবানী ইত্যাদি। অতএব যদি কোন ব্যক্তি নফল নামায, রোযা, সদকা ইত্যাদির মানত করে তবে এই নফল তার যিম্মায় ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে। আলোচ্য আয়াত থেকে তাই প্রমাণিত হয়। এতে মানত পূর্ণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

মাস'আলা ঃ স্মর্তব্য যে, শুধু মনে মনে কোন কাজ করার ইচ্ছা করলেই মানত হয় না, যে পর্যন্ত মানতের শব্দ মুখে উচ্চারণ না করে। তফসীরে-মাযহারীতে এস্থলে নযর ও মানতের বিধি-বিধান বিস্তারিতভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এখানে সেগুলো বর্ণনা করার অবকাশ নেই।

একটি প্রশ্ন ও জওয়াব ঃ এই আয়াতে পূর্বেও হজ্জের ক্রিয়াকর্ম, তথা কোরবানী ও ইহরাম খোলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরেও তওয়াফে-যিয়ারত-এর কথা বর্ণিত হয়েছে। মাঝখানে মানত পূর্ণ করার আলোচনা করা হয়েছে; অথচ মানত পূর্ণ করা একটি স্বতন্ত্র বিধান। হজ্জ, হজ্জ ছাড়াও, হেরেমে এবং হেরেমের বাইরে যে কোন দেশে মানত পূর্ণ করা যায়। অতএব আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্বন্ধ কি?

উত্তর এই যে, মানত পূর্ণ করা যদিও একটি স্বতন্ত্র নির্দেশ এবং হজ্জের দিন, হজ্জের ক্রিয়াকর্ম ও হেরেমের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়। কিন্তু হজ্জের ক্রিয়াকর্ম বর্ণনা প্রসঙ্গে একে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষ যখন হজ্জের জন্য রওয়ানা হয় তখন এই সফরে অধিক পরিমাণে সৎ কাজ ও ইবাদত করার স্পৃহা তার মনে জাগ্রত হয়। ফলে সে অনেক কিছুর মানতও করে, বিশেষত জন্তু কোরবানীর মানত তো ব্যাপকভাবেই প্রচলিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস এখানে মানতের অর্থ কোরবানীর মানতই করেছেন। হজ্জের বিধানের সাথে মানতের আরও একটি সম্বন্ধ এই যে, মানত ও কসমের কারণে যেমন মানুষের ওপর শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব নয়—এমন অনেক বিষয় ওয়াজিব হয়ে যায় এবং আসলে হারাম ও নাজায়েয নয়, এমন অনেক বিষয় হারাম ও নাজায়েয হয়ে যায়, তেমনিভাবে হজ্জের ক্রিয়াকর্ম, যা সারা জীবনে একবারেই ফরয হয়; কিন্তু হজ্জ ও ওমরার ইহরাম বাঁধার কারণে সব ক্রিয়াকর্ম তার ওপর ফরয হয়ে যায়। ইহরামের সব বিধান প্রায়শ এমনি ধরনেরই। সেলাই করা কাপড় ও সুগন্ধি ব্যবহার, চুল মুণ্ডানো, নখ কাটা ইত্যাদি স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে নাজায়েয কাজ নয়; কিন্তু ইহরাম বাঁধার কারণে এ সবগুলোই হারাম হয়ে যায়। এ কারণেই হযরত ইকরামা (রা) এ স্থলে মানতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এখানে হজ্জের ওয়াজিব কর্মসমূহ বোঝানো হয়েছে যেগুলো হজ্জের কারণে তার ওপর জরুরী হয়ে যায়।

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ—এখানে তওয়াফ বলে তওয়াফে-যিয়ারত বোঝানো হয়েছে, যা যিলহজ্জের দশ তারিখে কঙ্কর নিক্ষেপ ও কোরবানীর পর করা

হয়। এই তওয়াফ হজ্জের দ্বিতীয় রোকন ও ফরয। প্রথম রোকন আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা। এটা আরও পূর্বে আদায় করা হয়। তওয়াফে-যিয়ারতের পর ইহ্‌রামের সব বিধান পূর্ণতা লাভ করে এবং পূর্ণ ইহ্‌রাম খুলে যায়।---(রূহুল-মা'আনী)

بَيْتِ عَتِيْقٍ—عَتِيْق শব্দের অর্থ মুক্ত। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাঁর গৃহের নাম بَيْتِ عَتِيْق রেখেছেন ; কারণ আল্লাহ্ একে কাফির ও অত্যাচারীদের আধিপত্য ও অধিকার থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন।---(রূহুল- মা'আনী) কোন কাফিরের সাধ্য নেই যে, একে অধিকারভুক্ত করে। আসহাবে-ফীল তথা হস্তি বাহিনীর ঘটনা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। و الله اعلم

তফসীরে-মাযহারীতে এ স্থলে তওয়াফের বিস্তারিত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অনুধাবনযোগ্য।

ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ
وَ اُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ
مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ۝٣٠ حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ
بِهٖ ؕ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ
الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ۝٣١ ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ
يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ۝٣٢ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ
اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ۝٣٣

(৩০) এটা শ্রবণযোগ্য। আর কেউ আল্লাহ্‌র সম্মানযোগ্য বিধানাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে পালনকর্তার নিকট তা তার জন্য উত্তম। উল্লেখিত ব্যতিক্রমগুলো ছাড়া তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা কথন থেকে দূরে সরে থাক ; (৩১) আল্লাহ্‌র দিকে একনিষ্ঠ হয়ে, তার সাথে শরীক না করে ; এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করল ; সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, অতঃপর মৃতভোজী পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। (৩২) এটা শ্রবণযোগ্য। কেউ আল্লাহ্‌র নামযুক্ত বস্তুসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

করলে তা তো তার হৃদয়ের আল্লাহ্‌ভীতিপ্রসূত। (৩৩) চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত উপকার রয়েছে। অতঃপর এগুলোকে পৌঁছতে হবে মুক্ত গৃহ পর্যন্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এ কথা তো হল (যা ছিল হজ্জের বিশেষ বিধান।) এবং (এখন অন্যান্য সাধারণ বিধি-বিধান শোন, যাতে হজ্জ এবং হজ্জ ছাড়া অন্যান্য মাস'আলাও আছে) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সম্মানযোগ্য বিধি-বিধানকে সম্মান করে, তা তার জন্য তার পালন-কর্তার কাছে উত্তম। (বিধি-বিধানের জ্ঞান অর্জন করা এবং বিধি-বিধান পালনে যত্নবান হওয়াও বিধি-বিধানের সম্মান করার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানের সম্মান তার জন্য উত্তম এ কারণে যে, এটা আযাব থেকে মুক্তির উপকরণ এবং চিরস্থায়ী সুখের সামগ্রী।) কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া, যা তোমাদেরকে (সূরা আন-'আমের قُلْ لَّآ أَجِدُ فِيمَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا আয়াতে) পড়ে শোনানো হয়েছে (এই আয়াতে হারাম জন্তুসমূহের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, উহা ব্যতীত অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুকে) তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। (এখানে চতুষ্পদ জন্তুদের হালাল হওয়ার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকারের নিষেধাজ্ঞা থেকে কেউ যাতে সন্দেহ না করে যে, ইহ্‌রাম অবস্থায় চতুষ্পদ জন্তুও নিষিদ্ধ। আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার মাধ্যমেই যখন ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল সীমিত, তখন) তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক। (কেননা, মূর্তিদেরকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা প্রকাশ্য বিদ্রোহ। এ স্থলে শিরক থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ বিশেষভাবে এ কারণে দেওয়া হয়েছে যে, মক্কার মুশরিকরা তাদের হজ্জের 'লাব্বায়কা'র সাথে لَا شَرِيكَ لَكَ বাক্যটিও যোগ করে দিত; অর্থাৎ সেই মূর্তিগুলো ছাড়া আল্লাহ্‌র কোন শরীক নেই; যেগুলো স্বয়ং আল্লাহ্‌রই।) এবং মিথ্যা কথন থেকে দূরে সরে থাক; (বিশ্বাসগত মিথ্যা হোক; যেমন মুশরিকদের শিরকের বিশ্বাস কিংবা অন্য প্রকার মিথ্যা হোক।) আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে তার সাথে শরীক না করে এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে (তার অবস্থা এমন,) যেন সে আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, অতঃপর পাখীরা তাকে টুকরা টুকরা করে খেয়ে ফেলল কিংবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। একথাও (যা ছিল একটি সামগ্রিক নীতি) হয়ে গেল এবং (এখন কোরবানীর জন্তুদের সম্পর্কে একটি জরুরী কথা শুনে নাও) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ধর্মের (উপরোক্ত) স্মৃতিসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তবে তার এই সম্মান আন্তরিকভাবে আল্লাহ্‌কে ভয় করা থেকে অর্জিত হয়। (স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন বলে কোরবানী সম্পর্কিত খোদায়ী বিধানাবলীর অনুসরণ বোঝানো হয়েছে; যবেহ্ করার পূর্বের বিধানাবলী হোক কিংবা যবেহ্

করার সময়কার হোক; যেমন জন্তুর ওপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা কিংবা যবেহ্‌র পরবর্তী বিধানাবলী হোক; যেমন কোরবানীর গোশ্‌ত খাওয়া না খাওয়া। যে কোরবানীর গোশ্‌ত যার জন্য হালাল, সে তা খাবে এবং যে কোরবানীর গোশ্‌ত যার জন্য হালাল নয়, সে তা খাবে না। এসব বিধানের কতিপয় ধারা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে এবং কিছু এখন করা হচ্ছে। তা এই যে,) এগুলো থেকে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত উপকার লাভ করা তোমাদের জন্য জায়েয (অর্থাৎ শরীয়তের নীতি অনুযায়ী চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে কা'বার জন্য উৎসর্গ না করা পর্যন্ত তোমরা এগুলো থেকে দুধ, সওয়ারী, পরিবহন ইত্যাদি কাজ নিতে পার। কিন্তু যখন এগুলোকে কা'বা ও হজ্ব অথবা ওমরার জন্য উৎসর্গ করা হবে, তখন এগুলোকে কাজে লাগানো জায়েয নয়)। এরপর (অর্থাৎ উৎসর্গিত হওয়ার পর) এগুলোর যবেহ্‌ হালাল হওয়ার স্থান মহিমান্বিত গৃহের নিকট (অর্থাৎ সম্পূর্ণ হেরেম। হেরেমের বাইরে যবেহ্‌ করা যাবে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

حُرُمَاتِ اللهِ—বলে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সম্মানযোগ্য বিষয়াদি অর্থাৎ শরীয়তের বিধানাবলী বোঝানো হয়েছে। এগুলোর সম্মান তথা এগুলো সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা এবং জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা ইহকাল ও পরকালে সৌভাগ্য লাভের উপায়।

أُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ বলে উট, গরু, ছাগল, মেষ, দুম্বা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এগুলো ইহ্‌রাম অবস্থায়ও হালাল। إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ—বাক্যে যেসব জন্তুর ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো অন্যান্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ মৃত জন্তু, যে জন্তুর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়নি কিংবা যে জন্তুর উপর অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। এগুলো সর্বাবস্থায় হারাম—ইহ্‌রাম অবস্থায় হোক কিংবা ইহ্‌রামের বাইরে।

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ—رجس শব্দের অর্থ অপবিত্রতা, ময়লা। أوثان শব্দটি وثن এর বহুবচন; অর্থ মূর্তি। মূর্তিদেরকে অপবিত্রতা বলা হয়েছে; কারণ এরা মানুষের অন্তরকে শিরকের অপবিত্রতা দ্বারা পূর্ণ করে দেয়।

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ—قول زور—এর অর্থ মিথ্যা। যা কিছু সত্যের

পরিপন্থী, তাই বাতিল ও মিথ্যাভুক্ত। শিরক ও কুফরের বিশ্বাস হোক কিংবা পারস্পরিক লেনদেন ও সাক্ষ্য প্রদানে মিথ্যা বলা হোক। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ বৃহত্তম কবীরা গোনাহ্ এগুলো ঃ আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা, পিতামাতার অবাধ্যতা করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং সাধারণ কথাবার্তায় মিথ্যা বলা। তিনি শেষোক্ত শব্দ قول الزور -কে বার বার উচ্চারণ করেন।---(বুখারী)

شَعَائِرَ শব্দটি شَعِيرَةٌ এর বহুবচন। এর অর্থ আলামত, চিহ্ন। যে যে বিষয়কে কোন বিশেষ মাযহাব অথবা দলের আলামত মনে করা হয়, সেগুলোকে তার شعائر বলা হয়। সাধারণের পরিভাষায় যে যে বিধানকে মুসলমান হওয়ার আলামত মনে করা হয়, সেগুলোকে 'শায়ায়েরে-ইসলাম' বলা হয়। হজ্জের অধিকাংশ বিধান তদ্রূপই।

مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ—অর্থাৎ আল্লাহ্র আলামতসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আন্তরিক আল্লাহ্ভীতির লক্ষণ। যার অন্তরে তাকওয়া ও আল্লাহ্ভীতি থাকে, সে-ই এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারে। এতে বোঝা গেল যে, মানুষের অন্তরের সাথেই তাকওয়ার সম্পর্ক। অন্তরে আল্লাহ্ভীতি থাকলে তার প্রতিক্রিয়া সব কাজে-কর্মে পরিলক্ষিত হয়।

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى—অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তু থেকে দুধ, সওয়ারী, মাল পরিবহন ইত্যাদি সর্ব প্রকার উপকার লাভ করা তোমাদের জন্য তখন পর্যন্ত হালাল, যে পর্যন্ত এগুলোকে হেরেম শরীফে যবেহ্ করার জন্য উৎসর্গ না কর। হজ্জ অথবা ওমরাকারী ব্যক্তি যবেহ্ করার জন্য যে জন্তু সাথে নিয়ে যায়, তাকে হাদী বলা হয়। যখন কোন জন্তুকে হেরেমের হাদী হওয়ার জন্য উৎসর্গ করা হয়, তখন তা থেকে কোন উপকার লাভ করা বিশেষ কোন অপারকতা ছাড়া জায়েয নয়। যদি কেউ উটকে হাদী করে সাথে নেয়, তার সাথে সওয়ারীর অন্য কোন জন্তু না থাকে এবং পায়ে হাঁটা তার জন্য খুবই কঠিন হয়ে পড়ে, তবে এরূপ অপারকতার কারণে সে হাদীর উটে সওয়ার হতে পারে।

ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ—এখানে بيت عتيق (সম্মানিত গৃহ) বলে সম্পূর্ণ হেরেম বোঝানো হয়েছে। হেরেম বায়তুল্লাহ্রই বিশেষ আঙিনা। যেমন পূর্ববর্তী আয়াতে 'মসজিদে-হারাম' বলে হেরেম বোঝানো হয়েছে। محل অর্থাৎ মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার স্থান। এখানে যবেহ্ করার স্থান বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে,

হাদীর জন্তু যবেহ্ করার স্থান বায়তুল্লাহ্র সন্নিকট অর্থাৎ সম্পূর্ণ হেরেম। এতে বোঝা গেল যে, হেরেমের ভিতরে হাদী যবেহ্ করা জরুরী, হেরেমের বাইরে জায়েয নয়। হেরেম মিনার কোরবানগাহ্ও হতে পারে, মক্কা মুকাররমার অন্য কোন স্থানও হতে পারে। —(রূহুল-মা'আনী)

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم
مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ
وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ
وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ
فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ
جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۗ كَذَٰلِكَ
سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا
وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا
لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

(৩৪) আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কোরবানী নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহ্র দেয়া চতুষ্পদ জন্তু যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে। অতএব তোমাদের আল্লাহ্ তো একমাত্র আল্লাহ্। সুতরাং তাঁরই আজ্ঞাধীন থাক এবং বিনয়ী-গণকে সুসংবাদ দাও; (৩৫) যাদের অন্তর আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা হলে ভীত হয় এবং যারা তাদের বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং যারা নামায কায়েম করে ও আমি যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে, (৩৬) এবং কা'বার জন্য উৎসর্গিত উটকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্র অন্যতম নিদর্শন করেছি। এতে তোমাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে বাধা অবস্থায় তাদের যবেহ্ করার সময় তোমরা আল্লা-হ্র নাম উচ্চারণ কর। অতঃপর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে তোমরা আহার কর এবং আহার করাও যে কিছু যাচঞা করে না তাকে এবং যে যাচঞা করে তাকে। এমনিভাবে আমি এগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৩৭) এগুলোর গোশত ও রক্ত আল্লাহ্র কাছে

পৌঁছে না; কিন্তু পৌঁছে তার কাছে তোমাদের মনের তাকওয়া। এমনিভাবে তিনি এগুলোকে তোমাদের বশ করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ঘোষণা কর এ কারণে যে, তিনি তোমাদেরকে পথপ্রদর্শক করেছেন। সুতরাং সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরে হেরেম-শরীফে কোরবানী করার যে আদেশ বর্ণিত হয়েছে, এতে কেউ যেন মনে না করে যে, আসল উদ্দেশ্য হেরেমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। প্রকৃতপক্ষে আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্‌র সম্মান ও তাঁর নৈকট্য লাভ করা। যবেহ্‌কৃত জন্তু ও যবেহ্‌র স্থান এর উপায় মাত্র এবং স্থানের বিশেষত্ব কোন কোন রহস্যের কারণে। যদি এই বিশেষত্ব আসল উদ্দেশ্য হত, তবে কোন শরীয়তেই তা পরিবর্তন হত না। কিন্তু এগুলোর পরিবর্তন সবারই জানা। তবে আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র নৈকট্য, এটা সব শরীয়তে সংরক্ষিত আছে। সেমতে) আমি (যত শরীয়ত অতিক্রান্ত হয়েছে, তাদের) প্রত্যেক উম্মতের জন্য কোরবানী নির্ধারণ করেছিলাম, যাতে তারা আল্লাহ্‌র দেয়া চতুষ্পদ জন্তুদের ওপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে (সুতরাং এই নাম উচ্চারণ করাই আসল উদ্দেশ্য ছিল)। অতএব (এ থেকে বোঝা গেল যে,) তোমাদের উপাস্য একই আল্লাহ্‌ (যাঁর নাম উচ্চারণ করে নৈকট্য লাভের আদেশ সবাইকে করা হত)। সুতরাং তোমরা সর্বান্তকরণে তাঁরই হয়ে থাক (অর্থাৎ খাঁটি তওহীদপন্থী থাক, কোন স্থান ইত্যাদিকে আসল সম্মানার্হ মনে করে শিরকের বিন্দু পরিমাণ নামগন্ধ নিজেদের আমলে প্রবিষ্ট হতে দিও না।) এবং [হে মুহাম্মদ (সা), যারা আমার এই শিক্ষা অনুসরণ করে] আপনি (আল্লাহ্‌র বিধানাবলীর সামনে) মস্তক নতকারীদেরকে (জান্নাত ইত্যাদির) সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। যারা (এই খাঁটি তওহীদের বরকতে) এমন যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহ্‌র (বিধানাবলী, গুণাবলী, ওয়াদা ও সতর্কবাণী) স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর ভীত হয় এবং যারা বিপদাপদে সবর করে এবং যারা নামায কায়েম করে এবং যারা আমি যা দিয়েছি, তা থেকে (আদেশ ও তওফীক অনুযায়ী) ব্যয় করে (অর্থাৎ খাঁটি তওহীদ এমন বরকতময় যে, এর বদৌলতে মানসিক, দৈহিক ও আর্থিক উৎকর্ষ সৃষ্টি হয়ে যায়। এমনিভাবে ওপরে আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রসঙ্গে কোন কোন উপকার লাভ নিষিদ্ধ বলে জানা গেছে। এ থেকেও সন্দেহ করা উচিত নয় যে, কোরবানী আসল সম্মানার্হ। কেননা, তা দ্বারাও আল্লাহ্‌ ও তাঁর ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন উদ্দেশ্য। বিশেষত্বগুলো তার একটি পন্থা মাত্র। সুতরাং) কোরবানীর উট ও গরুকে (এমনিভাবে ছাগল-ভেড়াকে) আমি আল্লাহ্‌র (ধর্মের) স্মৃতি করেছি (এ সম্পর্কিত বিধানাবলীর জ্ঞানার্জন ও আমল দ্বারা আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও ধর্মের সম্মান প্রকাশ পায়। আল্লাহ্‌র নামে উৎসর্গিত জন্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে রূপক মালিকের মতামত অগ্রাহ্য হলে তার দাসত্ব এবং সত্যিকার মালিক আল্লাহ্‌র উপাস্যতা প্রকাশ পায় এবং এই ধর্মীয় রহস্য ছাড়া)

এসব জন্তুর মধ্যে তোমাদের (আরও) উপকার আছে (যেমন পার্থিব উপকার নিজে খাওয়া ও অপরকে খাওয়ানো এবং পারলৌকিক উপকার সওয়াব।) সুতরাং (যখন এতে এসব রহস্য আছে, তখন) এগুলোর ওপর দণ্ডায়মান অবস্থায় (যবেহ্ করার সময়) আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ কর। (এটা শুধু উটের জন্যে বলা হয়েছে। কারণ, উটকে দণ্ডায়মান অবস্থায় যবেহ্ করা উত্তম। কারণ এতে যবেহ্ ও আত্মা নির্গমন সহজ হয়। সুতরাং এর ফলে পারলৌকিক উপকার অর্থাৎ সওয়াব অর্জিত হল এবং আল্লাহ্র মাহাত্ম্য প্রকাশ পেল। কেননা, তাঁর নামে একটি প্রাণের কোরবানী হল। ফলে তিনি যে স্রষ্টা এবং এটা যে সৃষ্টি, তা প্রকাশ করে দেয়া হল।) অতঃপর যখন উট কাত হয়ে পড়ে যায় (এবং ঠাণ্ডা হয়ে যায়), তখন তা থেকে তোমরাও খাও এবং আহার করাও যে যাঞ্চা করে, তাকে এবং যে যাঞ্চা করে না, তাকে (এরা بَائِس فَقِير এর দুই প্রকার। এটা পার্থিব উপকারও।) এমনিভাবে আমি এসব জন্তুকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি (তোমরা দুর্বল এবং তারা শক্তিশালী। এতদসত্ত্বেও তোমরা তাদেরকে এভাবে যবেহ্ করতে পার), যাতে তোমরা (এই অধীন করার কারণে আল্লাহ্ তা'আলার) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (এই রহস্য প্রত্যেক যবেহ্র মধ্যে---কোরবানীর হোক বা না হোক। অতঃপর যবেহ্র বিশেষত্বগুলো যে আসল উদ্দেশ্য নয়, তা একটি যুক্তির মাধ্যমে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, দেখ, এটা জানা কথা,) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এগুলোর গোশত ও রক্ত পৌঁছে না; কিন্তু তাঁর কাছে তোমাদের তাকওয়া (নৈকট্যের নিয়ত এবং আন্তরিকতা যার শাখা, অবশ্য) পৌঁছে। (সুতরাং এটাই আসল উদ্দেশ্য প্রমাণিত হল। ওপরে كَذٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا বলে অধীন করার একটি সাধারণ রহস্য বর্ণনা করা হয়েছিল; অর্থাৎ কোরবানী হোক বা না হোক। অতঃপর অধীন করার একটি বিশেষ রহস্য অর্থাৎ কোরবানী হওয়ার দিক দিয়ে বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) এমনিভাবে আল্লাহ্ এসব জন্তুকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা (এগুলোকে আল্লাহ্র পথে কোরবানী করে) আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ঘোষণা কর এ কারণে যে, তিনি তোমাদেরকে (এভাবে কোরবানী করার) তওফীক দিয়েছেন। (নতুবা আল্লাহ্র তওফীক পথপ্রদর্শক না হলে হয় যবেহ্র মধ্যেই সন্দেহ করে এই ইবাদত থেকে বঞ্চিত থাকতে, না হয় অন্যের নামে যবেহ্ করতে।) এবং [হে মুহাম্মদ (সা)] আপনি আন্তরিকতাশীলদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন (পূর্বেকার সুসংবাদ আন্তরিকতার শাখা সম্পর্কে ছিল। এটা বিশেষ করে আন্তরিকতা সম্পর্কে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا—আরবী ভাষায় نسك ও منسك কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক. জন্তু কোরবানী করা, দুই. হজ্বের ক্রিয়াকর্ম এবং তিন. ইবাদত।

কোরআন পাকে বিভিন্ন স্থানে এই শব্দটি তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তিন অর্থই হতে পারে। এ কারণেই তফসীরকারক মুজাহিদ প্রমুখ এখানে منسك এর অর্থ কোরবানী নিয়েছেন। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, এই উম্মতকে কোরবানীর যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা কোন নতুন আদেশ নয়, পূর্ববর্তী উম্মতদেরকেও কোরবানীর আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কাতাদাহ্ দ্বিতীয় অর্থ নিয়েছেন। তাঁর মতে আয়াতের অর্থ এই যে, হজ্জের ক্রিয়াকর্ম যেমন এই উম্মতের ওপর আরোপ করা হয়েছে, তেমনি পূর্ববর্তী উম্মতদের ওপরও হজ্জ ফরয করা হয়েছিল। ইবনে আরাফা তৃতীয় অর্থ ধরে আয়াতের অর্থ করেছেন যে, আমি আল্লাহ্র ইবাদত পূর্ববর্তী উম্মতদের ওপরও ফরয করেছিলাম। ইবাদতের পদ্ধতিতে কিছু কিছু পার্থক্য সব উম্মতেই ছিল; কিন্তু মূল ইবাদত সবার মধ্যে অভিন্ন ছিল।

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ---আরবী ভাষায় خبت শব্দের অর্থ নিম্নভূমি। এ কারণে এমন ব্যক্তিকে خبيث বলা হয়, যে নিজেকে হেয় মনে করে। এ জন্যই কাতাদাহ ও মুজাহিদ مخبتين -এর অর্থ করেছেন বিনয়ী। আমর ইবনে আউস বলেন ঃ এমন লোকদেরকে مخبتين বলা হয়, যারা অন্যের ওপর জুলুম করে না। কেউ তাদের ওপর জুলুম করলে তারা তার প্রতিশোধ নেয় না। সুফিয়ান বলেন ঃ যারা সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে ও অভাব-অনটনে আল্লাহ্র ফয়সালা ও তকদীরে সন্তুষ্ট থাকে, তারাই مخبتين

وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ -এর আসল অর্থ ঐ ভয়ভীতি, যা কাহারও মাহাত্ম্যের কারণে অন্তরে সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্র সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার যিকর ও নাম শুনে তাদের অন্তরে এক বিশেষ ভীতি সঞ্চার হয়ে যায়।

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ---পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলাম ধর্মের আলামতরূপে গণ্য হয়, এমন বিশেষ বিধি-বিধান ও ইবাদতকে شعائر বলা হয়। কোরবানীও এমন বিধানাবলীর অন্যতম। কাজেই এ ধরনের বিধানসমূহ পালন করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ صوافّ শব্দের অর্থ সারিবদ্ধভাবে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ জন্তু তিন পায়ে ভর দিয়ে দণ্ডায়মান থাকবে এবং এক পা বাঁধা থাকবে। উটের জন্য এই নিয়ম। দণ্ডায়মান অবস্থায় উট কোরবানী করা সুন্নত ও উত্তম। অবশিষ্ট সব জন্তুকে শোয়া অবস্থায় যবেহ্ করা সুন্নত।

فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا—এখানে وجبت-এর অর্থ سقطت ; যেমন বাকপদ্ধতিতে বলা হয় وجبت الشمس অর্থাৎ সূর্য ঢলে পড়েছে। এখানে জন্তুর প্রাণ নির্গত হওয়া বোঝানো হয়েছে।

اَلْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ----যাদেরকে কোরবানীর গোশ্‌ত দেওয়া উচিত, পূর্ববর্তী আয়াতে তাদেরকে بائس فقير বলা হয়েছে। এর অর্থ দুঃস্থ অভাবগ্রস্ত। এই আয়াতে তৎস্থলে قانع و معتر শব্দদ্বয়ের দ্বারা তার তফসীর করা হয়েছে। قانع ঐ অভাবগ্রস্ত ফকিরকে বলা হয়, যে কারও কাছে যাঞ্চা করে না, দারিদ্র্য সত্ত্বেও স্বস্থানে বসে থাকে এবং কেউ কিছু দিলে তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে معتر ঐ ফকিরকে বলা হয়, যে কিছু পাওয়ার আশায় অন্যত্র গমন করে,---মুখে সওয়াল করুক বা না করুক।---(মাযহারী)

ইবাদতের বিশেষ পদ্ধতি আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং মনের তাকওয়া ও আনুগত্যই আসল উদ্দেশ্যঃ لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا ---বাক্যে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, কোরবানী একটি মহান ইবাদত; কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে এর গোশ্‌ত ও রক্ত পৌঁছে না এবং কোরবানীর উদ্দেশ্যও এগুলো নয়; বরং আসল উদ্দেশ্য জন্তুর ওপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা এবং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে পালনকর্তার আদেশ পালন করা। অন্য সব ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যও তাই। নামাযে ওঠাবসা করা, রোযায় ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকা আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করাই আসল লক্ষ্য। আন্তরিকতা ও মহব্বতবর্জিত ইবাদত প্রাণহীন কাঠামো মাত্র। কিন্তু ইবাদতের শরীয়ত-সম্মত কাঠামোও এ-কারণে জরুরী যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার আদেশ পালনের জন্য এই কাঠামো নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। والله اعلم

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٨﴾

---

(৩৮) আল্লাহ্‌ মুমিনদের থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দেবেন। আল্লাহ্‌ কোন বিশ্বাস-ঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা (মুশরিকদের প্রাধান্য ও নির্যাতনের শক্তিকে) মুমিনদের থেকে (সত্বরই) হটিয়ে দেবেন (এরপর হজ্ব ইত্যাদি কর্মে তারা বাধাই দিতে পারবে না)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা কোন বিশ্বাসঘাতক কুফরকারীকে পছন্দ করেন না। (বরং এরূপ লোকদের প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট। পরিণামে তিনি তাদেরকে পরাভূত এবং মুমিনদেরকে জয়ী করবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছিল যে, মুশরিকরা রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীদেরকে হেরেম শরীফ ও মসজিদে-হারামে প্রবেশ করতে এবং ওমরা আদায় করতে বাধা দিয়েছিল; অথচ তাঁরা ওমরার ইহ্রাম বেঁধে মক্কার নিকটবর্তী হোদায়-বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে এই ওয়াদা দিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে আল্লাহ্ তা'আলা সত্বরই মুশরিকদের শক্তি ভেঙ্গে দেবেন। ষষ্ঠ হিজরীতে এই ঘটনা ঘটেছিল। এরপর থেকে উপর্যুপরি কাফির মুশরিকদের শক্তি দুর্বল ও তারা মনোবলহীন হতে থাকে। অবশেষে অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজিত হয়ে যায়। পরবর্তী আয়াতসমূহে এর বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ
لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا
أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ
لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا
اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ
لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

(৩৯) যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল তাদেরকে যাদের সাথে কাফিররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। (৪০) যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু

এই অপরাধে যে, তারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্। আল্লাহ্ যদি মানব জাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খৃস্টানদের) নির্জন গির্জা, ইবাদতখানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহ্র নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহ্র সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী শক্তিধর। (৪১) তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র এখতিয়ারভুক্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এ পর্যন্ত বিভিন্ন উপকারিতার কারণে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি ছিল না; কিন্তু এখন) তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল, যাদের সাথে (কাফির-পক্ষ থেকে) যুদ্ধ করা হয়; কারণ তাদের প্রতি (ঘোর) অত্যাচার করা হয়েছে। (এটা যুদ্ধ বৈধকরণের কারণ) এবং (এই অনুমতি প্রদানের অবস্থায় মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা ও কাফিরদের আধিক্যের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত নয়। কেননা) নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে জয়ী করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। (অতঃপর মুসলমানগণ কিরূপ নির্যাতিত হচ্ছে, তা বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) যাদেরকে তাদের ভিটেমাটি থেকে অন্যায়-ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্ (অর্থাৎ তওহীদ বিশ্বাস করার কারণেই কাফিররা তাদের প্রতি নির্যাতনের স্টীমরোলার চালায়। ফলে তারা দেশত্যাগে বাধ্য হয়। অতঃপর জিহাদ বৈধকরণের রহস্য বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) আল্লাহ্ যদি (অনাদিকাল থেকে) মানুষের এক দলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, (অর্থাৎ সত্যপন্থীদেরকে অসত্যপন্থীদের ওপর জয়ী না করতেন) তবে (নিজ নিজ আমলে) খৃস্টানদের নির্জন উপাসনালয়, ইবাদতখানা, ইহুদীদের ইবাদতখানা এবং (মুসলমানদের) মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত (ও নিশ্চিহ্ন) হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহ্র নাম অধিক পরিমাণে স্মরণ করা হয়। (অতঃপর সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে যে, আন্তরিকতার সাথে জিহাদ করলে বিজয় দান করা হবে)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহ্র (দীনের) সাহায্য করে (অর্থাৎ আল্লাহ্র কলেমা সমুন্নত করাই যুদ্ধের খাঁটি নিয়ত হওয়া চাই)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা পরাক্রমশালী (ও) শক্তিধর। (তিনি যাকে ইচ্ছা শক্তি ও বিজয় দিতে পারেন! অতঃপর জিহাদকারীদের ফযিলত বয়ান করা হচ্ছে ঃ) তারা এমন যে, যদি আমি তাদেরকে পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করি, তবে তারা নিজেরাও নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং (অপরকেও) সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। সব কাজের পরিণাম তো আল্লাহ্রই ইখতিয়ারভুক্ত। (সুতরাং মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা দেখে কিরূপে বলা যায় যে, পরিণামেও তারা তদ্রূপই থাকবে; বরং এর বিপরীত হওয়াও সম্ভবপর। সেমতে তাই হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রথম আদেশঃ মক্কায় মুসলমানদের উপর কাফিরদের নির্যাতন চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। এমন কোন দিন যেত না যে, কোন-না-কোন মুসলমান তাদের নিষ্ঠুর হাতে আহত ও প্রহৃত হয়ে না আসত। মক্কায় অবস্থানের শেষ দিনগুলোতে মুসলমানদের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা কাফিরদের জুলুম ও অত্যাচার দেখে তাদের মুকাবিলায় যুদ্ধ করার অনুমতি চাইতেন। কিন্তু রসূলে করীম (সা) জওয়াবে বলতেনঃ সবর কর। আমাকে এখনও যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি। দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত এমনিতর পরিস্থিতি অব্যাহত রইল। ---(কুরতুবী)

যখন রসূলে করীম (সা) মক্কা ত্যাগ করতে ও হিজরত করতে বাধ্য হন এবং হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর সঙ্গী ছিলেন, তখন মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় তাঁর মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হয়ঃ اخرجوا نبيهم ليهلكن অর্থাৎ এরা তাদের পয়গম্বরকে বহিষ্কার করেছে। এখন তাদের ধ্বংস অনিবার্য। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মদীনায় পৌঁছার পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে মুসলমানদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।---(কুরতুবী)

তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা, ইবনে হাইয়্যান, হাকিম প্রমুখের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস বলেনঃ এই প্রথম আয়াত কাফিরদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে অবতীর্ণ হল। ইতিপূর্বে সত্তরেরও অধিক আয়াতে যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

জিহাদ ও যুদ্ধের একটি রহস্যঃ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ---এতে জিহাদ ও যুদ্ধের রহস্য এবং এটা যে নতুন নির্দেশ হয়, তা বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মত ও পয়গম্বরদেরকেও কাফিরদের মুকাবিলায় যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরূপ না করা হলে কোন মাযহাব ও ধর্মের অস্তিত্ব থাকত না এবং সব ধর্ম ও উপাসনালয় বিধ্বস্ত হয়ে যেত।

لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوٰتٌ وَّمَسَاجِدُ---বিগত যমানায় যত ধর্মের ভিত্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং ওহীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এরপর রহিত হয়ে গেছে এবং পরিবর্তিত হয়ে কুফর ও শিরকে পরিণত হয়েছে, সেইসব ধর্মের উপাসনালয়সমূহের নাম এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, স্ব স্ব যমানায় তাদের উপাসনালয়গুলোর সম্মান ও সংরক্ষণ ফরয ছিল। আয়াতে সেসব ধর্মের উপাসনালয়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি, যেগুলোর ভিত্তি কোন সময়ই নবুয়ত ও ওহীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না; যেমন অগ্নিপূজারী মজুস অথবা মূর্তিপূজারী হিন্দু। কেননা, তাদের ইবাদতখানা কোন সময়ই সম্মানার্হ ছিল না।

صَوَامِعُ—শব্দটি صومعة -এর বহুচন। এটা খৃস্টানদের সংসার ত্যাগী দরবেশদের বিশেষ ইবাদতখানা। بِيَعٌ শব্দটি بيعة -এর বহুচন। খৃস্টানদের সাধারণ গির্জাকে بيعة বলা হয়। صَلَوَاتٌ শব্দটি صلوت -এর বহুবচন। ইহুদীদের ইবাদতখানাকে صلوت এবং মুসলমানদের ইবাদতখানাকে مساجد বলা হয়।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফিরদের সাথে যুদ্ধ ও জিহাদের আদেশ অবতীর্ণ না হলে কোন সময়েই কোন ধর্মের নিরাপত্তা থাকত না। মূসা (আ)-র আমলে صلوت, ঈসা (আ)-র আমলে صوامع ও بيع এবং শেষ নবী (সা)-র যমানায় মসজিদ-সমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত।—(কুরতুবী)

খুলাফায়ে রাশিদীনের পক্ষে কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী ও তার প্রকাশঃ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ—এই আয়াতে তাদের বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের বর্ণনা اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ আয়াতে ছিল; অর্থাৎ যাদেরকে তাদের ভিটেমাটি থেকে বিনা কারণে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি তাদেরকে পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিলে তারা তাদের ক্ষমতাকে নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, সৎ কর্মে আদেশ ও অসৎ কর্মে নিষেধের কাজে প্রয়োগ করবে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই আয়াত মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরে তখন অবতীর্ণ হয়, যখন মুসলমানদের কোথাও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে পূর্বেই বলে দিলেন যে, তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করলে তা ধর্মের উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনে ব্যয় করবে। এ কারণেই হযরত ওসমান গনী (রা) বলেন ঃ ثناء قبل بلاء অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'-আলার এই ইরশাদ কর্ম অস্তিত্ব লাভ করার পূর্বেই কর্মীদের গুণ ও প্রশংসা কীর্তন করার শামিল এরপর আল্লাহ্ তা'আলার এই নিশ্চিত সংবাদ দুনিয়াতে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। চারজন খুলাফায়ে-রাশিদীন এবং মুহাজিরগণ اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا আয়াতের বিশুদ্ধ প্রতিচ্ছবি ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকেই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করলেন এবং কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর অনুরূপ তাদের কর্ম ও কীর্তি বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, তাঁরা তাঁদের ক্ষমতা এ কাজেই ব্যবহার করেন।

তাঁরা নামায প্রতিষ্ঠিত করেন, যাকাতের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন, সৎ কাজের প্রবর্তন করেন এবং মন্দ কাজের পথ রুদ্ধ করেন।

এ কারণেই আলিমগণ বলেন ঃ এই আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, খুলাফায়ে-রাশিদীন সবাই এই সুসংবাদের যোগ্য পাত্র ছিলেন এবং তাঁদের আগমনে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তা সত্য, বিশুদ্ধ এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, সন্তুষ্টি ও আগমন সংবাদের অনুরূপ ছিল।---(রূহুল-মা'আনী)

এ হচ্ছে আলোচ্য আয়াতের শানে-নুযূলের ঘটনাভিত্তিক দিক। কিন্তু বলা বাহুল্য, কোরআনের ভাষা ব্যাপক হলে তা কোন বিশেষ ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং নির্দেশও ব্যাপক হয়ে থাকে। এ কারণেই তফসীরবিদ যাহ্‌হাক বলেন ঃ এই আয়াতে তাদের জন্যেই নির্দেশ রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন করেন। ক্ষমতাসীন থাকাকালে তাদের এমন সব কর্ম আনজাম দেওয়া উচিত, যেগুলো খুলাফায়ে-রাশিদীন তাদের যমানায় আনজাম দিয়েছিলেন।---(কুরতুবী)

وَإِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ
وَّثَمُوْدُ ﴿٤٢﴾ وَقَوْمُ إِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ ﴿٤٣﴾ وَّأَصْحٰبُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ
مُوْسٰى فَأَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ
نَكِيْرِ ﴿٤٤﴾ فَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ
خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ ﴿٤٥﴾
أَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَا أَوْ
أٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى
الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ ﴿٤٦﴾ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَ
لَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ
سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿٤٧﴾ وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ
ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا ۚ وَإِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿٤٨﴾ قُلْ يٰأَيُّهَا
النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤٩﴾ فَالَّذِيْنَ أٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝ وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْٓ
اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝

(৪২) তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছে কওমে নূহ, আদ, সামূদ (৪৩) ইবরাহীম ও লূতের সম্প্রদায়ও। (৪৪) এবং মাদইয়ানের অধিবাসীরা এবং মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল মূসাকেও। অতঃপর আমি কাফিরদেরকে সুযোগ দিয়েছিলাম এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম। অতএব কি ভীষণ ছিল আমাকে অস্বীকৃতির পরিণাম! (৪৫) আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি এমতাবস্থায় যে, তারা ছিল গোনাহ্‌গার। এই সব জনপদ এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছে ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদ ধ্বংস হয়েছে! (৪৬) তারা কি এই উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করে নি, যাতে তারা সমঝদার হৃদয় ও শ্রবণশক্তিসম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারে? বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ হয় না; কিন্তু বক্ষস্থিত অন্তরই অন্ধ হয়। (৪৭) তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে; অথচ আল্লাহ্ কখনও তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। আপনার পালনকর্তার কাছে একদিন তোমাদের গণনার এক-হাজার বছরের সমান। (৪৮) এবং আমি কত জনপদকে অবকাশ দিয়েছি এমতাবস্থায় যে, তারা গোনাহ্‌গার ছিল। এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছি এবং আমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (৪৯) বলুনঃ হে লোকসকল! আমি তো তোমাদের জন্য স্পষ্ট ভাষায় সতর্ককারী। (৫০) সুতরাং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎ কর্ম করেছে, তাদের জন্য আছে পাপ মার্জনা এবং সম্মানজনক রুযী। (৫১) এবং যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার জন্য চেষ্টা করে, তারাই দোযখের অধিবাসী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং তারা (অর্থাৎ বিতর্ককারীরা) যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে (আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা) তাদের পূর্বে কওমে নূহ, আদ, সামূদ, ইবরাহীম ও লূতের সম্প্রদায় এবং মাদইয়ানের অধিবাসীরাও (নিজ নিজ পয়গম্বরকে) মিথ্যাবাদী বলেছে। এবং মূসা (আ)-কেও মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। (কিন্তু মিথ্যাবাদী বলার পর) আমি কাফিরদেরকে (কিছুদিন) সুযোগ দিয়েছিলাম, (যেমন বর্তমান কাফিরদেরকে সুযোগ দিয়ে রেখেছি।) এরপর তাদেরকে (আযাবে) পাকড়াও করলাম। অতএব (দেখ,) আমার আযাব কেমন ছিল! আমি কত জনপদ (আযাব দ্বারা) ধ্বংস করেছি এমতাবস্থায় যে, তারা নাফরমানী করত। এসব জনপদ এখন ছাদের ওপর পতিত স্তূপে পরিণত হয়েছে (অর্থাৎ জনমানব শূন্য। স্বভাবত প্রথমে ছাদ ও ও পরে প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়। এমনিভাবে এসব জনপদ) কত পরিত্যক্ত কূপ (যেগুলো

পূর্বে আবাদ ছিল) ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদ (যা এখন ভগ্নস্তূপ---এসব জনপদে ধ্বংস করা হয়েছে। এমনিভাবে প্রতিশ্রুত সময় আসলে এযুগের মানুষকেও আযাব দ্বারা পাকড়াও করা হবে।) তারা কি দেশভ্রমণ করে নি, যাতে তারা এমন হৃদয়ের অধিকারী হয়, যদ্দ্বারা বোঝে এবং এমন কর্ণের অধিকারী হয়, যদ্দ্বারা শ্রবণ করে। বস্তুত (যারা বোঝে না, তাদের) চক্ষু তো অন্ধ নয়; বরং (বক্ষস্থিত) অন্তরই অন্ধ হয়ে যায়। (বর্তমান কাফিরদেরও অন্তর অন্ধ হয়ে গেছে; নতুবা পরবর্তী লোকদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত।) তারা (নবুয়তে সন্দেহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে) আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে (আযাব তাড়াতাড়ি না আসায় তারা প্রমাণ করতে চায় যে, আযাব আসবেই না) অথচ আল্লাহ্ কখনও তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করবেন না (অর্থাৎ ওয়াদার সময় অবশ্যই আযাব আসবে।) এবং আপনার পালনকর্তার কাছে একদিন (যেদিন আযাব আসবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন---তা দৈর্ঘ্যে অথবা কঠোরতায়) তোমাদের গণনা অনুযায়ী এক হাজার বছরের সমান। (সুতরাং তারা নেহাৎ নির্বোধ বলেই এমন ধরনের বিপদ ত্বরান্বিত করতে বলে।) এবং (উল্লিখিত জওয়াবের সারমর্ম আবার শুনে নাও যে) আমি কত জনপদকে অবকাশ দিয়েছিলাম এমতাবস্থায় যে, তারা নাফরমানী করত, অতঃপর তাদেরকে (আযাবে) পাকড়াও করেছি। সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। (তখন পূর্ণ শাস্তি পাবে।) আপনি (আরও) বলে দিনঃ হে লোকগণ, আমি তো তোমাদের জন্য একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। (আযাব আসা না আসার ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই। আমি এর দাবিও করি নি।) সুতরাং যারা (এই সতর্কবাণী শোনে) বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম করে, তাদের জন্য আছে মাগফেরাত ও সম্মানজনক রুযী এবং যারা আমার আয়াত সম্পর্কে (অস্বীকার ও বাতিল করার) চেষ্টা করে, (নবীকে ও মু'মিনদেরকে) হারাবার (অর্থাৎ অক্ষম করার) জন্য, তারাই দোযখের অধিবাসী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শিক্ষা ও দূরদৃষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দেশভ্রমণ ধর্মীয় কাম্য ঃ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ---এই আয়াতে শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশভ্রমণে উৎসাহিত করা হয়েছে। فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ---বাক্যে ইঙ্গিত আছে যে, অতীত কাল ও অতীত জাতিসমূহের অবস্থা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করলে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি বৃদ্ধি পায়। তবে শর্ত এই যে, এসব অবস্থা শুধু ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গিতেও দেখতে হবে। ইবনে আবী হাতেম কিতাবুত্তাফাক্কুরে মালেক ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে আদেশ দেন যে, লোহার

জুতা ও লোহার লাঠি তৈরী কর এবং আল্লাহ্‌র পৃথিবীতে এত ঘোরাফেরা কর যে, লোহার জুতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় এবং লোহার লাঠি ভেঙ্গে যায়।---(রূহুল-মা'আনী) এই রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ হলে এই ভ্রমণ ও পর্যটনের উদ্দেশ্য জ্ঞান ও চক্ষুষ্মানতা অর্জন করা বৈ অন্য কিছু নয়।

পরকালের দিন এক হাজার বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্য ঃ إِنَّ يَوْمًا

عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ ---অর্থাৎ আপনার পালনকর্তার এক দিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হবে। এই দিন বলে কিয়ামতের দিন বোঝানো যেতে পারে। এই দিনটি এক হাজার বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্য এই যে, ভয়াবহ ঘটনাবলী ও ভয়ংকর অবস্থার কারণে এই দিনটি এক হাজার বছরের সমান দীর্ঘ মনে হবে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে একেই اشتداد (দীর্ঘ মনে হওয়া) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অনেক তফসীরকারক এখানে এই অর্থই নিয়েছেন।

বাস্তবক্ষেত্রেও পরকালের একদিন সার্বক্ষণিকভাবে দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হতে পারে। কোন কোন হাদীসে এর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন নিঃস্ব মুহাজিরদের উদ্দেশে বললেন, আমি তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দিচ্ছি ; আরও বলছি যে, তোমরা ধনীদের থেকে অর্ধেক দিন পূর্বে বেহেশতে যাবে। আল্লাহ্‌র একদিন এক হাজার বছরের সমান হবে। কাজেই নিঃস্বরা ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।---(মাযহারী)

তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই দ্বিতীয় অর্থটি امتداد শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। والله اعلم

একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব ঃ সূরা মায়ারেজে পরকালের দিনকে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান বলা হয়েছে। আয়াত এই ঃ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

---এতেও উপরোক্ত উভয় প্রকার তফসীর হতে পারে। প্রত্যেকের সংকট ভিন্ন ভিন্ন ও কম-বেশি হবে, তাই এই দিনটি কারও কাছে এক হাজার বছরের সমান এবং কারও কাছে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান অনুভূত হবে। দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী পরকালের দিনকে প্রকৃতই পঞ্চাশ হাজার বছরের ধরা হলে উভয় আয়াত বাহ্যত পরস্পর বিরোধী হয়ে যায় ; অর্থাৎ এক আয়াতে এক হাজার বছর এবং অপর আয়াতে পঞ্চাশ হাজার বছরের উল্লেখ আছে। এই বিরোধিতার জওয়াব মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বয়ানুল-কোরআনে উল্লেখ করেছেন।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى
الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ
يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى
الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ
قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ۝ وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ
اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ
قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝
وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ
بَغْتَةً اَوْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ ۝ اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۗ
يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۗ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ
النَّعِيْمِ ۝ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝ ع

(৫২) আমি আপনার পূর্বে যে সমস্ত রসূল ও নবী প্রেরণ করেছি, তারা যখনই কিছু কল্পনা করেছে, তখনই শয়তান তাদের কল্পনায় কিছু মিশ্রণ করে দিয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ দূর করে দেন শয়তান যা মিশ্রণ করে। এরপর আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ্ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়, (৫৩) এ কারণে যে, শয়তান যা মিশ্রণ করে, তিনি তা পরীক্ষাস্বরূপ করে দেন, তাদের জন্য, যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং যারা পাষাণ হৃদয়। গোনাহ্গাররা দূরবর্তী বিরোধিতায় লিপ্ত আছে; (৫৪) এবং এ কারণেও যে, যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে; তারা যেন জানে যে, এটা আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য; অতঃপর তারা যেন এতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন এর প্রতি বিজয়ী হয়। আল্লাহ্ই বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেন। (৫৫) কাফিররা সর্বদাই সন্দেহ পোষণ করবে যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আকস্মিকভাবে কিয়ামত এসে পড়ে অথবা এসে পড়ে তাদের কাছে এমন দিবসের শাস্তি যা থেকে রক্ষার উপায় নেই। (৫৬) রাজত্ব সেদিন আল্লাহ্রই; তিনিই তাদের বিচার

করবেন। অতএব যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে তারা নেয়ামতপূর্ণ কাননে থাকবে (৫৭) এবং যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তাদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি রয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং [হে মোহাম্মদ (সা), এরা যে শয়তানের প্ররোচনায় আপনার সাথে তর্ক-বিতর্ক করে, এটা নতুন কিছু নয়; বরং] আমি আপনার পূর্বে যে সমস্ত রসূল ও নবী প্রেরণ করেছি, তারা যখনই (আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান থেকে) কিছু আবৃত্তি করেছে, তখনই শয়তান তাদের আবৃত্তিতে (কাফিরদের মনে) সন্দেহ (ও আপত্তি) প্রক্ষিপ্ত করেছে। (কাফিররা এসব সন্দেহ ও আপত্তি উত্থাপন করে পয়গম্বরদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করত; যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيٰٓئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ -

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের প্রক্ষিপ্ত সন্দেহকে (অকাট্য জওয়াব ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা) নিশ্চিহ্ন করে দেন। (এটা জানা কথা যে, বিশুদ্ধ জওয়াবের পর আপত্তি দূর হয়ে যায়।) এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেন (পূর্বেও প্রতিষ্ঠিত ছিল; কিন্তু আপত্তির জওয়াব দ্বারা এই প্রতিষ্ঠা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে)। আল্লাহ্ তা'আলা (এসব আপত্তি সম্পর্কে) জ্ঞানময় (এবং এগুলোর জওয়াব শিক্ষাদানে) প্রজ্ঞাময়। (এই ঘটনা বর্ণনা করার কারণ এই যে) শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে, আল্লাহ্ তা'আলা তা তাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করে দেন, যাদের অন্তরে (সন্দেহের) রোগ আছে এবং যাদের অন্তর (সম্পূর্ণই) পাষাণ যে, তারা সন্দেহ পেরিয়ে মিথ্যার প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে। তাদেরকে পরীক্ষা করা হয় যে, দেখা যাক জওয়াবের পরও তারা সন্দেহের অনুসরণ করে, না জওয়াব হৃদয়ঙ্গম করে সত্যকে গ্রহণ করে। বাস্তবিকই (এই) জালিমরা (অর্থাৎ সন্দেহকারীরা এবং মিথ্যায় বিশ্বাস পোষণকারীরা) সুদূর বিরোধিতায় লিপ্ত আছে। (কারণ, সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা হঠকারিতাবশত তা কবুল করে না। পরীক্ষার জন্যই শয়তানকে কুমন্ত্রণা দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল) এবং (বিশুদ্ধ জওয়াব ও হেদায়েতের নূর দ্বারা এ সব সন্দেহ এ কারণে বাতিল করা হয় যে) যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তারা যেন (এসব জওয়াব ও হেদায়েতের নূরের সাহায্যে) দৃঢ় বিশ্বাস করে যে, এটা (অর্থাৎ নবী যা আবৃত্তি করেছেন)

আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য, অতঃপর তারা যেন ঈমানে সুদৃঢ় হয়ে যায় এবং (দৃঢ় বিশ্বাসের বরকতে) তাদের অন্তরে যেন এর (আমল করার) প্রতি অধিক বিনয়ী হয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলাই বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেন। (এমতাবস্থায় তাদের হেদায়েত হবে না কেন? এ হচ্ছে মু'মিনদের অবস্থা।) আর কাফিররা সর্বদাই এ সম্পর্কে (অর্থাৎ পঠিত নির্দেশ সম্পর্কে) সন্দেহই পোষণ করবে (যে সন্দেহ শয়তান তাদের মনে প্রক্ষিপ্ত করেছিল।) যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আকস্মিকভাবে কিয়ামত এসে পড়ে (আযাব না হলেও যার ভয়াবহতাই যথেষ্ট) অথবা (তদুপরি) এসে পড়ে তাদের কাছে অকল্যাণ দিবসের (অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের) শাস্তি। (বাস্তবে উভয়টিরই সমাবেশ হবে এবং তা হবে চরম বিপদের কারণ। উদ্দেশ্য এই যে, তারা আযাব প্রত্যক্ষ না করে কুফর থেকে বিরত হবে না; কিন্তু তখন তা ফলদায়ক হবে না।) রাজত্ব সেদিন আল্লাহ্ তা'আলারই হবে। তিনি তাদের (কার্যকর) ফয়সালা করবেন। অতএব যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সৎ কর্ম করবে, তারা সুখ-কাননে বাস করবে এবং যারা কুফরী করবে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলবে, তাদের জন্য থাকবে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مِن رَّسُولٍ وَّلَا نَبِيٍّ----এ থেকে জানা যায় যে, রসূল ও নবী এক নয় পৃথক পৃথক অর্থ রাখে। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। প্রসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট উক্তি এই যে, নবী তাঁকে বলা হয়, যাঁকে জনগণের সংস্কারের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নবুয়তের পদ দান করা হয় এবং তাঁর কাছে ওহী আগমন করে---তাঁকে কোন স্বতন্ত্র কিতাব ও শরীয়ত দান করা হোক বা কোন পূর্ববর্তী নবীর কিতাব ও শরীয়ত প্রচারে আদিষ্ট করা হোক। যাঁকে স্বতন্ত্র কিতাব ও শরীয়ত দান করা হয়, তাঁর দৃষ্টান্ত হযরত মূসা, ঈসা (আ) ঐ শেষনবী মোহাম্মদ মোস্তফা (সা)। এবং যে পূর্ববর্তী নবীর কিতাব ও শরীয়ত প্রচারে আদিষ্ট, তাঁর দৃষ্টান্ত হযরত হারূন (আ)। তিনি মূসা (আ)-র কিতাব তওরাত ও তাঁরই শরীয়ত প্রচারে আদিষ্ট ছিলেন। 'রসূল' তাঁকে বলা হয়, যাঁকে স্বতন্ত্র কিতাব ও শরীয়ত দান করা হয়। এ থেকে আরও জানা গেল যে, যিনি রসূল হবেন, তিনি নবীও হবেন। এটা জরুরী; কিন্তু যিনি নবী হবেন, তাঁর রসূল হওয়া জরুরী নয়। এই ভাগাভাগি মানুষের ক্ষেত্রে। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে ফেরেশতা ওহী নিয়ে আগমন করেন, তাঁকে রসূল বলা এর পরিপন্থী নয়। সূরা মারইয়ামে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ—আয়াতে تَمَنَّى শব্দের অর্থ قَرَأَ (আবৃত্তি করে) এবং أُمْنِيَّةٌ শব্দের অর্থ قِرَاءَةٌ অর্থাৎ আবৃত্তি করা। আরবী অভিধানে এ অর্থও প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। তফসীরের সার-সংক্ষেপে আয়াতের যে তফসীর লিপি-

বদ্ধ হয়েছে, তা অত্যন্ত পরিষ্কার ও নির্মল। আবূ হাইয়ান বাহ্‌রে-মুহীত গ্রন্থে এবং আরও অনেক তফসীরকারক এ তফসীরই গ্রহণ করেছেন। হাদীস গ্রন্থাদিতে এস্থলে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যা 'গারানিক' নামে খ্যাত। অধিক সংখ্যক হাদীস-বিদগণের মতে ঘটনাটি ভিত্তিহীন। কেউ কেউ একে বানোয়াট ও ধর্মদ্রোহীদের আবিষ্কার বলে আখ্যা দিয়েছেন। আর যারা একে ধর্তব্যও বলেছেন, হাদীসের বাহ্যিক ভাষাদৃষ্টে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র অকাট্য নির্দেশাবলী সম্পর্কে যেসব সন্দেহ দেখা দেয়, তাঁরা সেসব সন্দেহের জওয়াবও দিয়েছেন। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, এই আয়াতের তফসীর এই ঘটনার ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং ওপরে যা বর্ণনা করা হয়েছে, তাই এ আয়াতের সহজ ও সরল ব্যাখ্যা। ঘটনাটিকে অহেতুক আয়াতের তফসীরের অংশ সাব্যস্ত করে সন্দেহ ও সংশয়ের দ্বার উন্মোচন এবং অতঃপর জওয়াবদানে ব্যাপৃত হওয়া মোটেই লাভজনক কাজ নয়। তাই এ পথ পরিহার করা হল। والله اعلم

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ
اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٥٨﴾ لَيُدْخِلَنَّهُم
مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾

(৫৮) যারা আল্লাহ্‌র পথে গৃহ ত্যাগ করেছে, এরপর নিহত হয়েছে অথবা মরে গেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন এবং আল্লাহ্ সর্বোৎকৃষ্ট রিযিক দাতা। (৫৯) তাদেরকে অবশ্যই এমন এক স্থানে পৌঁছবেন, যাকে তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহ্ জ্ঞানময়, সহনশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা আল্লাহ্‌র পথে (অর্থাৎ দীনের হেফাযতের জন্য) নিজ গৃহ ত্যাগ করেছে (যাদের কথা পূর্ববর্তী الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে) এরপর কাফিরদের মুকাবিলায় নত হয়েছে অথবা (এমনিতেই স্বাভাবিক) মৃত্যুবরণ করেছে, (তারা ব্যর্থকাম ও বঞ্চিত নয়; যদিও তারা পার্থিব উপকারিতা লাভ করতে পারে নি; কিন্তু পরকালে) আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তাদেরকে উৎকৃষ্ট রিযিক দেবেন (অর্থাৎ জান্নাতের অগণিত নিয়ামত) এবং অবশ্যই আল্লাহ্ সর্বোৎকৃষ্ট রিযিক-দাতা। (এই উৎকৃষ্ট রিযিকের সাথে) আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে (ঠিকানাও উৎকৃষ্ট দিবেন অর্থাৎ) এমন এক স্থানে দাখিল করবেন, যাকে তারা (খুবই) পসন্দ করবে। (এখন প্রশ্ন রইল যে, কোন কোন মুহাজির পার্থিব বিজয়, সাহায্য ও উপ-

কারিতা থেকে কেন বঞ্চিত হল এবং কাফিররা তাদেরকে হত্যা করতে কিরূপে সক্ষম হল? কাফিরদেরকে আল্লাহ্‌র গজব দ্বারা ধ্বংস করা হল না কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর এই যে) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা (প্রত্যেক কাজে রহস্য ও উপকারিতা সম্পর্কে) জ্ঞানময়, (তাদের এই বাহ্যিক ব্যর্থতার মধ্যে অনেক উপকারিতা ও রহস্য নিহিত আছে এবং) অত্যন্ত সহনশীল। (তাই শত্রুদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দেন না।)

ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝

(৬০) এ তো শুনলে, যে ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে নিপীড়ন পরিমাণে প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং পুনরায় সে নিপীড়িত হয়, আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এ (বিষয়বস্তু) তো হল, (এরপর শোন যে) যে ব্যক্তি (শত্রুকে) ততটুকুই নিপীড়ন করে, যতটুকু (শত্রুর পক্ষ থেকে) তাকে নিপীড়ন করা হয়েছিল, এরপর (সমান সমান হয়ে যাওয়ার পর যদি শত্রুর পক্ষ থেকে) সে অত্যাচারিত হয়, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।

(কয়েক আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মযলুম তথা অত্যাচারিতকে সাহায্য করেন; وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ —কিন্তু মযলুম দুই প্রকার। এক, যে শত্রুর কাছ থেকে কোন প্রতিশোধই গ্রহণ করে না; বরং ক্ষমা করে দেয় কিংবা চুপ করে বসে থাকে। দুই, যে শত্রুর কাছ থেকে সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এরূপ ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ যখন সমান হয়ে যায়, তখন বাদ বিসম্বাদ শেষ হয়ে যাওয়া উচিত; কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণের কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে শত্রু যদি পুনরায় তার ওপর আক্রমণ করে বসে এবং আরও জুলুম করে, তবে এ ব্যক্তি মযলুমই থেকে যায়। আলোচ্য আয়াতে এই দ্বিতীয় প্রকার মযলুমকে সাহায্য করারই ওয়াদা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সবর করে প্রতিশোধ গ্রহণে বিরত থাকাই আল্লাহ্‌র কাছে পসন্দনীয়; যেমন অনেক আয়াতে তা বর্ণনা করা হয়েছে; উদাহরণত

(১) وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى (২) فَمَنْ عَفٰى وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ

(৩) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ----এসব আয়াতে প্রতিশোধ গ্রহণে বিরত থাকার প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছে এবং ক্ষমা করতে ও সবর করতে বলা হয়েছে। কোরআন পাকের এসব নির্দেশ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এপন্থাই উৎকৃষ্ট। যে ব্যক্তি শত্রুর কাছ থেকে সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে, সে এই উত্তম পন্থা ও কোরআনী নির্দেশাবলী পালন করে না। কাজেই সন্দেহ হতে পারত যে, সে বোধহয় আল্লাহ্‌র সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবে। তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এই ব্যক্তির উত্তমপন্থা বর্জন করার ত্রুটি ধরবেন না; বরং সে পুনরায় অত্যাচারিত হলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাকে সাহায্য করা হবে।

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ
وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٦١﴾ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا
يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۖ
إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٣﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا
فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ
أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ
رَحِيمٌ ﴿٦٥﴾ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾

(৬১) এটা এ জন্য যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাত্রির মধ্যে দাখিল করে দেন এবং আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন, দেখেন। (৬২) এটা এ কারণেও যে,

আল্লাহ্ই সত্য আর তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে, তা অসত্য এবং আল্লাহ্ই সবার উচ্চে, মহান। (৬৩) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর ভূপৃষ্ঠ সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী সর্ববিষয় খবরদার। (৬৪) নভোমণ্ডল ও ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, সব তাঁরই এবং আল্লাহ্ই অভাবমুক্ত প্রশংসার অধিকারী। (৬৫) তুমি কি দেখ না যে, ভূপৃষ্ঠে যা আছে এবং সমুদ্রে চলমান নৌকা তৎসমুদয়কে আল্লাহ্ নিজ আদেশে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং তিনি আকাশকে স্থির রাখেন, যাতে তাঁর আদেশ ব্যতীত ভূপৃষ্ঠে পতিত না হয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি করুণাশীল, দয়াবান। (৬৬) তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করেছেন, অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন ও পুনরায় জীবিত করবেন। নিশ্চয় মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এটা (অর্থাৎ মু'মিনদেরকে বিজয়ী করা) এজন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা (সর্বশক্তিমান। তিনি) রাত্রিকে (অর্থাৎ রাত্রির অংশ বিশেষকে) দিনের মধ্যে এবং দিনকে (অর্থাৎ দিনের অংশ বিশেষকে) রাত্রির মধ্যে দাখিল করে দেন। (এই নৈসর্গিক পরিবর্তন এক জাতিকে অন্য জাতির উপর বিজয়ী করে দেওয়ার মত বিপ্লবের চাইতে অধিক আশ্চর্যজনক।) এবং এ কারণে যে, আল্লাহ্ তা'আলা (তাদের কথাবার্তা ও অবস্থা) সম্যক শুনেন ও খুব দেখেন। (তিনি শুনেন ও দেখেন যে, কাফিররা যালিম ও মু'মিনরা মযলুম। তাই তিনি সব অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাতও এবং তাঁর শক্তি সামর্থ্যও সর্ববৃহৎ এই সমষ্টিই কারণ দুর্বলদেরকে জয়ী করার।) এটা (অর্থাৎ সাহায্য) এ কারণেও (নিশ্চিত) যে, (এতে বাধা দেওয়ার শক্তি কারও নেই। কেননা) আল্লাহ্-তা'আলাই পরিপূর্ণ সত্তা এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তারা যাদের ইবাদত করে, তারা সম্পূর্ণই অপদার্থ। (কেননা, তারা আপন সত্তায় যেমন পরমুখাপেক্ষী, তেমনি দুর্বল। এমতাবস্থায় তাদের সাধ্য কি যে, আল্লাহ্কে বাধা দেয়?) আল্লাহ্ তা'আলাই সবার উচ্চে, মহান। (এ বিষয়ে চিন্তা করলে তওহীদ যে সত্য এবং শিরক বাতিল, তা সবাই বুঝতে পারে। এ ছাড়া) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, ফলে ভূপৃষ্ঠ সবুজ শ্যামল হয়ে যায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত মেহেরবান, সর্ববিষয়ে খবরদার। তাই বান্দাদের প্রয়োজন সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে উপযুক্ত মেহেরবাণী করেন।) যা কিছু আকাশ মণ্ডলে আছে এবং যা কিছু ভূপৃষ্ঠে আছে, সব তাঁরই। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলাই অভাবমুক্ত, সর্বপ্রকার প্রশংসার যোগ্য। (হে সম্বোধিত ব্যক্তি!) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে রেখেছেন পৃথিবীস্থ বস্তুসমূহকে এবং জলযানগুলোকেও (৩), যা তাঁর আদেশে সমুদ্রে চলমান হয় এবং তিনিই আকাশকে স্থির রেখেছেন, যাতে ভূপৃষ্ঠে পতিত না হয়; কিন্তু যদি তাঁর আদেশ হয়ে যায়, (তবে সবকিছু হতে পারে। বান্দাদের গোনাহ্ ও মন্দ কাজের পরিপ্রেক্ষিতে যদিও এরূপ আদেশ করেন না। কারণ এই যে) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা

মানুষের প্রতি অত্যন্ত করুনাশীল, পরম দয়ালু। তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, অতঃপর (প্রতিশ্রুত সময়ে) মৃত্যু দান করবেন এবং পুনরায় (কিয়ামতে) জীবিত করবেন। (এ সব নিয়ামত ও অনুগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে তওহীদ মেনে নেওয়া ও কৃতজ্ঞ হওয়া মানুষের উচিত ছিল; কিন্তু) বাস্তবিকই মানুষ বড় নিমকহারাম। (ফলে এখনও কুফর ও শিরক থেকে বিরত হয় না। এখানে সব মানুষকে বোঝানো হয় নি; বরং তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে, যারা নিমকহারামিতে লিপ্ত রয়েছে)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ ---অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ভূপৃষ্ঠের সবকিছুকে মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। অধীন করার বাহ্যিক ও সাধারণ অর্থ এরূপ মনে করা হয় যে, তারা মানুষের আজ্ঞাধীন হয়ে চলবে। এই অর্থের দিক দিয়ে এখানে সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, ভূপৃষ্ঠের পাহাড়, নদী, হিংস্রজন্তু, পশুপক্ষী ইত্যাদি হাজারো বস্তু মানুষের আজ্ঞাধীন হয়ে চলে না। কিন্তু কোন কিছুকে মানুষের সার্বক্ষণিক সেবায় নিয়োজিত করে দেওয়াও প্রকৃতপক্ষে তার অধীন করে দেওয়ারই নামান্তর। এ কারণেই তফসীরের সার-সংক্ষেপে تسخير এর তরজমা "কাজে নিয়োজিত করা" দ্বারা করা হয়েছে। সবকিছুকে মানুষের আজ্ঞাধীন করে দেওয়ার শক্তিও আল্লাহ্ তা'আলার ছিল। কিন্তু এর পরিণাম স্বয়ং মানুষের জন্য ক্ষতিদায়ক হত। কারণ, মানুষের স্বভাব, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন বিভিন্নরূপ। জনৈক লেখক নদীকে কোন এক নির্দিষ্ট দিকে গতি পরিবর্তনের আদেশ করত, অন্য আর একজন তার বিপরীত দিকে আদেশ করত। এর পরিণাম অনর্থ সৃষ্টি ছাড়া কিছুই হত না। একারণেই আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুকে আজ্ঞাধীন তো নিজেরই রেখেছেন; কিন্তু অধীন করার যে আসল উপকার তা মানুষকে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ
وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ
اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا
كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾

(৬৭) আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য ইবাদতের একটি নিয়ম-কানূন নির্ধারণ করে দিয়েছি, যা তারা পালন করে। অতএব তারা যেন এ ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক না করে। আপনি তাদেরকে পালনকর্তার দিকে আহ্বান করুন। নিশ্চয় আপনি সরল পথেই আছেন। (৬৮) তারা যদি আপনার সাথে বিতর্ক করে, তবে বলে দিন ঃ তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অধিক জ্ঞাত। (৬৯) তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছ, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন সেই বিষয়ে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। (৭০) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ জানেন যা কিছু আকাশে ও ভূমণ্ডলে আছে। এসব কিতাবে লিখিত আছে। এটা আল্লাহ্র কাছে সহজ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যত শরীয়তধারী উম্মত অতিক্রান্ত হয়েছে) আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য যবেহ্ করার পদ্ধতি নির্ধারিত করে দিয়েছি; তারা এভাবেই যবেহ্ করে। অতএব তারা (অর্থাৎ আপত্তিকারীরা) যেন এ (যবেহ্র) ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক না করে। (তাদের তো আপনার সাথে বিতর্ক করার অধিকার নাই; কিন্তু আপনার অধিকার আছে। তাই) আপনি তাদেরকে প্রতিপালকের (অর্থাৎ তাঁর ধর্মের) দিকে আহ্বান করুন। আপনি নিশ্চিতই বিশুদ্ধ পথে আছেন। (বিশুদ্ধ পথের পথিক ভ্রান্ত পথের পথিককে নিজের পথে আহবান করার অধিকার রাখে; কিন্তু ভ্রান্ত পথিকের এরূপ অধিকার নাই।) তারা যদি (এরপরও) আপনার সাথে বিতর্ক করে, তবে বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। (তিনিই তোমাদের সাথে বুঝাপড়া করবেন। অতঃপর এরই ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে ঃ) আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে (কার্যত) ফয়সালা করবেন যেসব বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে। (এরপর এরই সমর্থনে বলা হয়েছে ঃ হে সম্বোধিত ব্যক্তি) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যা কিছু আকাশে ও ভূ-মণ্ডলে আছে। (আল্লাহ্র জ্ঞানে সংরক্ষিত হওয়ার সাথে এটাও) নিশ্চিত যে, (তাদের) এসব (কথাবার্তা ও অবস্থা) আমলনামায়ও লিখিত আছে। (অতএব) নিশ্চয়ই (প্রমাণিত হল) এটা (অর্থাৎ ফয়সালা করা) আল্লাহ্র কাছে সহজ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ----এই বিষয়বস্তুই প্রায় এমনি শব্দ সহযোগে আলোচ্য সূরার ৩৪ নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু উভয় স্থলে مَنْسَك শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। সেখানে مَنْسَك ও نُسُك কোরবানীর অর্থে হজ্জের বিধানাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছিল। এজন্য সেখানে و ل সহকারে وَلِكُلِّ أُمَّةٍ বলা হয়েছিল। এখানে مَنْسَك -এর অন্য অর্থ (অর্থাৎ যবেহ্ করার বিধানাবলী

অথবা শরীয়তের বিধানাবলীর জ্ঞান) বোঝানো হয়েছে এবং এটা একটা স্বতন্ত্র বিধান। তাই এখানে و او সহকারে বলা হয় নি।

এই আয়াতের এক তফসীর তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন কোন কাফির মুসলমানদের সাথে তাদের যবেহ্ করা জন্তু সম্পর্কে অনর্থক তর্কবিতর্ক করত। তারা বলত ঃ তোমাদের ধর্মের এই বিবাদ আশ্চর্যজনক যে, যে জন্তুকে তোমরা স্বহস্তে হত্যা কর, তা তো হালাল এবং যে জন্তুকে আল্লাহ্ তা'আলা সরাসরি মৃত্যু দান করেন অর্থাৎ সাধারণ মৃতজন্তু, তা হারাম। তাদের এই বিতর্কের জওয়াবে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।--- (রূহুল-মা'আনী) অতএব এখানে منسك এর অর্থ হবে যবেহ্ করার নিয়ম। জওয়াবের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক উম্মত ও শরীয়তের জন্য যবেহের বিধান পৃথক পৃথক রেখেছেন। রসূলে-করীম (সা)-এর শরীয়ত একটি স্বতন্ত্র শরীয়ত। এই শরীয়তের বিধি-বিধানের মুকাবিলা কোন পূর্ববর্তী শরীয়তের বিধি-বিধান দ্বারা করাও জায়েয নয়; অথচ তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত মতামত ও বাতিল চিন্তাধারার দ্বারা এর মুকাবিলা করছ। এটা কিরূপে জায়েয হতে পারে? মৃতজন্তু হালাল নয়, এটা এই উম্মত ও শরীয়তেরই বৈশিষ্ট্য নয়; পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহেও তা হারাম ছিল। সুতরাং তোমাদের এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই ভিত্তিহীন কথার ওপর ভিত্তি করে পয়গম্বরের সাথে বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া একেবারেই নির্বুদ্ধিতা।---(রূহুল-মা'আনী) সাধারণ তফসীরকারকদের মতে منسك শব্দের অর্থ এখানে শরীয়তের সাধারণ বিধি-বিধান। কেননা, অভিধানে এর অর্থ নির্দিষ্ট স্থান, যা কোন বিশেষ ভাল অথবা মন্দ কাজের জন্য নির্ধারিত থাকে। একারণেই হজ্বের বিধি-বিধানকে مناسك الحج বলা হয়। কেননা, এগুলোতে বিশেষ বিশেষ স্থান বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য নির্ধারিত আছে।---(ইবনে-কাসীর) কামূসে نسك শব্দের অর্থ লিখা হয়েছে ইবাদত। কোরআনে وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। مناسك বলে ইবাদতের বিধানাবলী বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এই দ্বিতীয় তফসীরও বর্ণিত আছে। ইবনে জরীর, ইবনে কাসীর, কুরতুবী, রূহুল-মা'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে এই ব্যাপক অর্থের তফসীরই গ্রহণ করা হয়েছে। আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাও এই অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করে যে, منسك বলে শরীয়তের সাধারণ বিধানাবলী বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, মুশরিক ও ইসলাম-বিদ্বেষীরা মুহাম্মদী শরীয়তের বিধানাবলী সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে। তাদের তর্কের ভিত্তি এই যে, তাদের পৈতৃক ধর্মে এসব বিধান ছিল না। তারা শুনে নিক যে, কোন পূর্ববর্তী শরীয়ত ও কিতাব দ্বারা নতুন শরীয়ত ও কিতাবের মুকাবিলা করা বাতিল। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক উম্মতকে তার সময়ে বিশেষ শরীয়ত ও কিতাব দিয়েছেন। অন্য কোন উম্মত ও শরীয়ত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে না আসা পর্যন্ত সেই শরীয়তের অনুসরণ সে উম্মতের জন্য বৈধ ছিল। কিন্তু যখন অন্য শরীয়ত আগমন করে,

তখন তাদেরকে এই নতুন শরীয়তের অনুসরণ করতে হবে। নতুন শরীয়তের কোন বিধান পূর্ববর্তী শরীয়তের বিরোধী হলে প্রথম বিধানকে 'মনসূখ' তথা রহিত এবং দ্বিতীয় বিধানকে 'নাসেখ' তথা রহিতকারী মনে করা হবে। কাজেই যিনি নতুন শরীয়তের বাহক, তাঁর সাথে কাউকে তর্ক-বিতর্কের অনুমতি দেওয়া যায় না। আয়াতের সর্বশেষ বাক্য فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ ---এর সারমর্মও তাই। অর্থাৎ বর্তমানকালে যখন শেষনবী (সা) একটি স্বতন্ত্র শরীয়ত নিয়ে আগমন করেছেন, তখন তাঁর শরীয়তের বিধি-বিধান নিয়ে তর্কবিতর্ক করার অধিকার কারও নেই।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, প্রথম তফসীর ও এই দ্বিতীয় তফসীরের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নেই। কারণ, আয়াত যদেহ্ সম্পর্কিত তর্কবিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলেও আয়াতের ভাষা ব্যাপক ও শরীয়তের সব বিধি-বিধান এতে শামিল। ভাষার ব্যাপকতাই ধর্তব্য হয়ে থাকে---অবতরণ স্থলের বৈশিষ্ট্য ধর্তব্য নয়। কাজেই উভয় তফসীরের সারমর্ম এই হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন প্রত্যেক উম্মতকে আলাদা আলাদা শরীয়ত দিয়েছেন যার মধ্যে বিভিন্নমুখী খুঁটিনাটি বিধানও থাকে, তখন কোন পূর্ববর্তী শরীয়তের অনুসারীর এরূপ অধিকার নাই যে, নতুন শরীয়ত সম্পর্কে তর্কবিতর্ক করবে; বরং নতুন শরীয়তের অনুসরণ তার উপর ওয়াজিব। এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ অর্থাৎ আপনি তাদের আপত্তি বা তর্কবিতর্কে প্রভাবান্বিত হবেন না; বরং যথারীতি সত্যের প্রতি দাওয়াতের কর্তব্য পালনে মশগুল থাকুন। কারণ, আপনি সত্য ও সরল পথে আছেন। আপনার বিরোধীরাই পথচ্যুত।

একটি সন্দেহের কারণ ঃ উপরোক্ত আলোচনা থেকে আরও একটি বিষয় জানা গেল যে, মুহাম্মদী শরীয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পর পূর্ববর্তী সব শরীয়ত মনসূখ হয়ে গেছে। এখন যদি খৃস্টান, ইহুদী ইত্যাদি সম্প্রদায় বলে যে, এই আয়াতে স্বয়ং কোরআন বলেছে যে, প্রত্যেক শরীয়ত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগমন করেছে। কাজেই ইসলামের আমলেও যদি আমরা মূসা ও ঈসা (আ)-এর শরীয়ত মেনে চলি, তবে মুসলমানদের তাতে আপত্তি করা উচিত নয়। কেননা, স্বয়ং কোরআনই আমাদেরকে এই অবকাশ দিয়েছে। এর উত্তর এই যে, আয়াতে প্রত্যেক উম্মতকে বিশেষ শরীয়ত দেওয়ার কথা উল্লেখ করার পর বিশ্বের মানবমণ্ডলীকে এ আদেশও দেওয়া হয়েছে যে, মুহাম্মদী শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা যেন এর বিরোধিতা না করে। একথা বলা হয়নি যে, মুসলমানরা যেন পূর্ববর্তী শরীয়তের কোন বিধানের বিপক্ষে কথা না বলে। আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী আয়াতগুলো দ্বারা এই বিষয়বস্তু আরও ফুটে উঠে। এসব আয়াতে ইসলামের বিরুদ্ধে তর্ককারীদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে,

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তিনিই এর শাস্তি দিবেন। وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ
لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٧١﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا
بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ۖ يَكَادُونَ يَسْطُونَ
بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ
ذَٰلِكُمُ ۗ النَّارُ ۖ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٢﴾
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۗ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِنْ
يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ۗ ضَعُفَ الطَّالِبُ
وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾

(৭১) তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর পূজা করে, যার কোন সনদ নাযিল করা হয়নি এবং সে সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নাই। বস্তুত জালেমদের কোন সাহায্যকারী নাই। (৭২) যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, তখন তুমি কাফিরদের চোখেমুখে অসন্তোষের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করতে পারবে। যারা তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে, তারা তাদের প্রতি মারমুখো হয়ে ওঠে। বলুন, আমি কি তোমাদেরকে তদপেক্ষা মন্দ কিছুর সংবাদ দেব? তা আগুন; আল্লাহ্ কাফিরদেরকে এর ওয়াদা দিয়েছেন। এটা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল! (৭৩) হে লোকসকল! একটি উপমা বর্ণনা করা হল অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শুন; তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা কর, তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোনকিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন। (৭৪) তারা আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য মর্যাদা বুঝেনি। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং তারা (মুশরিকরা) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে, যাদের (ইবাদতের বৈধতা) সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন দলীল (স্বীয় কিতাবে) প্রেরণ করেননি এবং তাদের কাছে এর কোন (যুক্তিগত) প্রমাণ নেই এবং (কিয়ামতে যখন শিরকের কারণে তাদের শাস্তি হবে তখন) জালিমদের কোন সাহায্যকারী হবে না (অর্থাৎ তাদের কর্ম যে ভাল ছিল, এর কোন দলীলও কেউ পেশ করতে পারবে না এবং কার্যত কেউ তাদেরকে শাস্তির কবল থেকে বাঁচাতে পারবে না। গোমরাহী এবং সত্যপন্থীদের প্রতি শত্রুতা পোষণে তাদের বাড়াবাড়ি এত বেশি যে,) যখন তাদের সামনে আমার (তওহীদ ইত্যাদি সম্পর্কিত) সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ (সত্যপন্থীদের মুখ থেকে) আবৃত্তি করা হয়, তখন তুমি কাফিরদের চোখে-মুখে (আন্তরিক অসন্তোষের কারণে) মন্দ প্রতিক্রিয়া দেখতে পাবে (যেমন মুখমণ্ডল কুঞ্চিত হওয়া, নাক সিটকানো, ভ্রূ কুঞ্চন ইত্যাদি। এসব প্রতিক্রিয়া থেকে মনে হয়) যেন তারা তাদের উপর (এখন) আক্রমণ করে বসবে, যারা আয়াতসমূহ তাদের সামনে পাঠ করে। অর্থাৎ সর্বদাই আক্রমণের আশংকা হয় এবং মাঝে মাঝে হয়েও যায়। আপনি (মুশরিকদেরকে) বলেন ঃ (তোমরা যে কোরআনের আয়াতসমূহ শুনে নাক সিটকাও, তবে) আমি কি তোমাদেরকে তদপেক্ষা (অর্থাৎ কোরআন অপেক্ষা) মন্দ কিছুর সংবাদ দেব? তা আগুন। আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফিরদেরকে এর ওয়াদা দিয়েছেন। এটা নিকৃষ্ট ঠিকানা! (অর্থাৎ কোরআনকে সহ্য না করার ফল অসহনীয় দোযখ ভোগ। ক্রোধ, গোস্‌সা ও প্রতিশোধ দ্বারা তো এই বিরক্তি কিছুটা পুষিয়েও নাও। কিন্তু দোযখ ভোগের যে বিরক্তি, তার কোন প্রতিকার নেই। এরপর একটি জাজ্বল্যমান দলীল দ্বারা শিরক বাতিল করা হচ্ছে ঃ) লোক সকল! একটি বিচিত্র বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে শোন (তা এই যে), তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের ইবাদত কর, তারা (সামান্য) একটি মাছিই সৃষ্টি করতে পারে না, যদিও তারা সকলেই একত্রিত হয়। (সৃষ্টি করা তো বড় কথা, তারা তো এমন অক্ষম যে,) মাছি যদি তাদের কাছ থেকে (তাদের নৈবেদ্য থেকে) কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে উহা থেকে তারা তা উদ্ধার (ও) করতে পারে না। ইবাদতকারী ও যার ইবাদত করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন। (আফসোস,) তারা আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য সম্মান করেনি। (উচিত ছিল তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত না করা; কিন্তু তারা শিরক করতে শুরু করেছে। অথচ) আল্লাহ্‌ তা'আলা পরম শক্তিধর, সর্বশক্তিমান। (সুতরাং ইবাদত খাঁটিভাবে তাঁরই প্রাপ্য ছিল। যে শক্তিধর ও পরাক্রমশালী নয়, যার শক্তিহীনতা সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা জানা হয়ে গেছে, সে ইবাদতের যোগ্য নয়।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

একটি উপমা দ্বারা শিরক ও মূর্তিপূজার বোকাসুলভ কাণ্ডের ব্যাখ্যা ঃ ضُرِبَ مَثَلٌ

---এই শব্দটি সাধারণত কোন বিশেষ ঘটনার দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

এখানে তা উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে শিরক ও মূর্তিপূজার বোকামি একটি সুস্পষ্ট উপমা দ্বারা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে, যে মূর্তিদেরকে তোমরা কার্যোদ্ধারকারী মনে কর, তারা এতই অসহায় ও শক্তিহীন যে, সবাই একত্রিত হয়ে একটি মাছির ন্যায় নিকৃষ্ট বস্তুও সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টি করা তো বড় কথা, তোমরা রোজই তাদের সামনে মিষ্টান্ন, ফলমূল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য রেখে দাও। মাছিরা এসে সেগুলো খেয়ে ফেলে। মাছিদের কাছ থেকে নিজেদের ভোগের বস্তুকে বাঁচিয়ে রাখার শক্তিও তাদের হয় না। অতএব তারা তোমাদেরকে বিপদ থেকে কিরূপে উদ্ধার করবে? এ কারণেই আয়াতের শেষে ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ বলে তাদের মূর্খতা ও বোকামি ব্যক্ত করা হয়েছে; অর্থাৎ যাদের উপাস্যই এমন শক্তিহীন সেই উপাস্যের উপাসক আরও বেশি শক্তিহীন হবে। مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ অর্থাৎ এই নির্বোধ নিমকহারামরা আল্লাহ্‌র মর্যাদা বুঝেনি। ফলে এমন সর্বশক্তিমানের সাথে এমন শক্তিহীন ও চেতনাহীন প্রস্তরসমূহকে শরীক সাব্যস্ত করেছে।

واللّٰه اعلم

اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ
سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۭ وَاِلَى اللّٰهِ
تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا
رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ
جِهَادِهٖ ۭ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ
حَرَجٍ ۭ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ۭ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ
قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا
شُهَدَاۗءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ
اعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ۭ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝

(৭৫) আল্লাহ্ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রসূল মনোনীত করেন। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (৭৬) তিনি জানেন যা তাদের সামনে আছে এবং যা পশ্চাতে আছে এবং সবকিছু আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৭৭) হে মু'মিনগণ, তোমরা রুকূ কর, সিজদা কর, তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর এবং সৎ কাজ সম্পাদন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (৭৮) তোমরা আল্লাহ্র জন্য শ্রম স্বীকার কর যেভাবে শ্রম স্বীকার করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মে কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কোরআনেও, যাতে রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা হয় এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্কে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মালিক। অতএব তিনি কত উত্তম মালিক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা (স্বাধীন। তিনি) রিসালতের জন্য (যাকে চান মনোনীত করেন ফেরেশতাদের মধ্য থেকে (যে ফেরেশতাদেরকে চান আল্লাহ্র) বিধান (পয়গম্বরদের কাছে) পৌঁছানেওয়ালা (নিযুক্ত করেন) এবং (এমনিভাবে) মানুষের মধ্য থেকেও (যাকে চান সাধারণ মানুষের কাছে বিধান পৌঁছানেওয়ালা নিযুক্ত করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্র মনোনয়নের উপরই রিসালত ভিত্তিশীল। এতে ফেরেশতা হওয়ার কোন বিশেষত্ব নেই; বরং যেভাবে ফেরেশতা রসূল হতে পারে, যা মুশরিকরাও স্বীকার করে, তেমনিভাবে মানবও রসূল হতে পারে। এখন প্রশ্ন রইল যে, মনোনয়ন বিশেষ একজনকে কেন দান করা হয়? এর বাহ্যিক কারণ রসূলগণের অবস্থার বৈশিষ্ট্য এবং এটা) নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা (অর্থাৎ) তিনি (সব ফেরেশতা ও মানুষের) ভবিষ্যৎ ও অতীত অবস্থাসমূহ (খুব) জানেন (অতএব বর্তমান অবস্থা তো আরও উত্তমরূপে জানবেন। মোটকথা, সব দেখা ও শোনা অবস্থা তাঁর জানা। তন্মধ্যে কারও কারও অবস্থা এই মনোনয়নের পশ্চাতে কাজ করেছে।) এবং (প্রকৃত কারণ এর এই যে,) সব কাজ আল্লাহ্ তা'আলারই উপর নির্ভরশীল (অর্থাৎ তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ মালিক ও স্বাধীন কর্তা। তাঁর ইচ্ছা এককভাবে সবকিছুর অগ্রাধিকার নিয়ন্ত্রণ করে। এই ইচ্ছার জন্য কোন অগ্রাধিকারীর প্রয়োজন নেই। সুতরাং প্রকৃত কারণ আল্লাহ্র ইচ্ছা এবং এর কারণ জিজ্ঞাসা করা অনর্থক। لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ আয়াতের অর্থ তাই; অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাকে তাঁর কোন কর্মের কারণ জিজ্ঞাসা করার অধিকার কারও নেই।

এই সূরার উপসংহারে প্রথমে শাখাগত বিধান ও শরীয়ত বর্ণনা করা হয়েছে। এবং ইবরাহীমী ধর্মে অটল থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর প্রতি উৎসাহ দানের

নিমিত্ত কতক বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে।) হে মু'মিনগণ, (তোমরা মৌলিক বিধান মেনে নেওয়ার পর শাখাগত বিধানও পালন কর; বিশেষত নামাযের বিধান। সুতরাং) তোমরা রুকূ কর, সিজদা কর এবং (সাধারণভাবে অন্যান্য শাখাগত বিধানও পালন করে) তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর। আশা করা যায় যে, (অর্থাৎ ওয়াদা করা হচ্ছে যে,) তোমরা সফলকাম হবে। আল্লাহ্‌র কাজে অক্লান্ত চেষ্টা কর, যেমন চেষ্টা করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে (অন্যান্য উম্মত থেকে) স্বতন্ত্র করেছেন। (যেমন جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا—ইত্যাদি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।) এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। (হে মু'মিনগণ! যে ইসলামের বিধি-বিধান পুরোপুরি পালন করার আদেশ তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তাই ইবরাহীমী মিল্লাত।) তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাতের উপর কায়েম থাক। তিনি তোমাদের উপাধি 'মুসলমান' রেখেছেন পূর্বেও এবং এতেও (অর্থাৎ কোরআনেও), যাতে রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা হয় এবং (রসূলের সাক্ষ্যদানের পূর্বে) তোমরা একটি বড় মোকদ্দমায়, যার এক পক্ষ পয়গম্বরগণ এবং প্রতিপক্ষ তাঁদের বিরোধী জাতিসমূহ হবে; বিরোধী) লোকদের বিপক্ষে সাক্ষ্যদাতা হও (রসূলের সাক্ষ্য দ্বারা তোমাদের সাক্ষ্য সমর্থিত হবে এবং পয়গম্বরগণের পক্ষে ফয়সালা হবে।) সুতরাং (আমার বিধি-বিধান পুরোপুরি পালন কর। অতএব) তোমরা (বিশেষভাবে) নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং (অবশিষ্ট বিধানেও) আল্লাহ্‌কে শক্তভাবে ধারণ কর (অর্থাৎ দৃঢ় সংকল্প ও সাহসিকতার সাথে ধর্মের বিধি-বিধান পালন কর। আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের সন্তুষ্টি, অসন্তুষ্টি এবং প্রবৃত্তির লাভ ক্ষতির দিকে ভ্রূক্ষেপ করো না)। তিনি তোমাদের কার্যোদ্ধারকারী। (অতএব) তিনি কতই না উত্তম কার্যোদ্ধারকারী এবং কত উত্তম সাহায্যকারী!

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হজ্বের সিজদায়ে তিলাওয়াত ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ ——সূরা হজ্বে এক আয়াতে পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, যাতে সর্বসম্মতিক্রমে সিজদায়ে-তিলাওয়াত ওয়াজিব। এখানে উল্লিখিত আয়াতে সিজদায়ে-তিলাওয়াত ওয়াজিব কি না, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, সুফিয়ান সওরী (র)-এর মতে এই আয়াতে সিজদায়ে-তিলাওয়াত ওয়াজিব নয়। কেননা, এতে সিজদার সাথে রুকূ ইত্যাদিও উল্লিখিত হয়েছে। এতে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এখানে নামাযের সিজদা বোঝানো হয়েছে, যেমন وَاسْجُدِي وَارْكَعِي আয়াতে সবাই একমত যে, এতে নামাযের

সিজদা উদ্দেশ্য ! (এই আয়াত তিলাওয়াত করলে সিজদা ওয়াজিব হয় না। এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতেও সিজদায়ে-তিলাওয়াত ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ প্রমুখের মতে এই আয়াতেও সিজদায়ে-তিলাওয়াত ওয়াজিব। তাঁদের প্রমাণ সেই হাদীস, যাতে বলা হয়েছে ঃ সূরা হজ্ব অন্যান্য সূরার উপর এই শ্রেষ্ঠত্ব রাখে যে, এতে দুইটি সিজদায়ে-তিলাওয়াত আছে। ইমাম আযমের মতে এই হাদীসটি প্রামাণ্য নয়। এর বিস্তারিত বিবরণ ফিকাহ্ ও হাদীসের কিতাবাদিতে দ্রষ্টব্য।

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ — জিহাদ ও مجاهدة শব্দের অর্থ কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করা এবং তজ্জন্য কষ্ট স্বীকার করা। কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও মুসলমানরা তাদের কথা, কর্ম ও সর্বপ্রকার সম্ভাব্য শক্তি ব্যয় করে। তাই এই যুদ্ধকেও জিহাদ বলা হয়। حق جهاده-এর অর্থ সম্পূর্ণ আল্লাহ্র ওয়াস্তে জিহাদ করা, তাতে জাগতিক নামযশ ও গনীমতের অর্থ লাভের লালসা না থাকা।

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ حق جهاد--এর অর্থ জিহাদে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে কর্ণপাত না করা। কোন কোন তফসীরবিদের মতে এখানে জিহাদের অর্থ সাধারণ ইবাদত ও আল্লাহ্র বিধি-বিধান পালনে পূর্ণ শক্তি ও পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে ব্যয় করা।

যাহ্হাক ও মুকাতিল বলেন ঃ আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, اعملوا حق عمله واعبدوه حق عبادته ---অর্থাৎ আল্লাহ্র জন্য কাজ কর যেমন করা উচিত এবং আল্লাহ্র ইবাদত কর যেমন করা উচিত। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক বলেন ঃ এ স্থলে জিহাদ বলে নিজ প্রবৃত্তি ও অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ করা বোঝানো হয়েছে এবং এটাই حق جهاد অর্থাৎ যথাযোগ্য জিহাদ। ইমাম বগভী প্রমুখ এই উক্তির সমর্থনে একটি হাদীসও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার সাহাবায়ে-কিরামের একটি দল কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযান শেষে ফিরে এলে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

قدمتم خير مقدم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر قال مجاهدة العبد لهواه---অর্থাৎ তোমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে চমৎকারভাবে ফিরে এসেছ। উদ্দেশ্য এই যে, প্রবৃত্তির অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ এখনও অব্যাহত আছে। এই হাদীসটি ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করে বলেছেন যে, এর সনদে ত্রুটি আছে।

জ্ঞাতব্য ঃ তফসীরে-মাযহারীতে এই দ্বিতীয় তফসীর অবলম্বন করে আয়াত থেকে একটি তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা হয়েছে। তা এই যে, সাহাবায়ে কিরাম যখন কাফিরদের